মাসুদ রানা

সার্বিয়া চক্রান্ত

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7635-4

সার্বিয়া চক্রান্ত

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

এক

অন্ধকার হোটেল কামরায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। সড়সড় করে খাড়া হয়ে যাচ্ছে ঘাড়ের চুল। পরিচিত সেই অনুভূতিটা সতর্ক করে তুলল মাসুদ রানাকে—খুব কাছ থেকে কেউ যেন ওর ওপর নজর রাখছে।

কামরার ভেতর কেউ আছে। নিঃশ্বাস ফেলার কাঁপা কাঁপা শব্দ। লোকটা নার্ভাস, নাকি আতঙ্কিত? রানার বালিশের তলায় কোন অস্ত্র নেই। খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে, বেডসাইড টেবিলের আলোটা জ্বালার জন্যে কর্ডের দিকে হাত বাড়াল ও।

বেসুরো গলায় ফিসফিস করল লোকটা; ভাষাটা ইংরেজি, উচ্চারণে বলকান এলাকার টান। 'ভয় পাবেন না। আলোও জ্বালবেন না, প্লীজ। আমাকে মুর্তজা সাহেব পাঠিয়েছেন। কিন্তু এক লোক আমার পিছু নিয়ে...'

গুলির প্রচণ্ড শব্দে ঝাঁকি খেলো রানা, ঘরটাও কেঁপে উঠল। ভারী বস্তার মত কিছু একটা পড়ল বিছানার ওপর, একটা হাত ওর আঙুলগুলো খামচে ধরল করমর্দনের ভঙ্গিতে, পরমুহূর্তে শিথিল হয়ে গেল। নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়ার আগে ওয়ার্ড্রোবের সামনে ছায়ামূর্তিটাকে দেখতে পেল রানা। আততায়ী পিছু হটছে। তার পিছনে ফ্রেঞ্চ উইন্ডো, পর্দাটা উড়ছে বাতাসে। লাশের হাত থেকে আঙুলগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে অকস্মাৎ ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত বিছানা থেকে লাফ দিল রানা। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা পেল, সম্ভবত ওয়ার্ড্রোবের চোখা কোণটার সঙ্গে বাড়ি খেয়েছে। কিন্তু পড়ে যাবার সময় ছায়ামূর্তির হাতে উল্টো করে ধরা আগ্নেয়াস্ত্রটা দেখে বুঝতে পারল একপাশে সরে গিয়ে ওই লোকটাই ওর মাথায় বাড়ি মেরেছে। বন বন করে ঘুরছে ঘর, তালগাছের মত লম্বা ছায়ামূর্তি ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে, যেন দম ফুরিয়ে আসা একটা লাটিম। তারপর প্রায় নাচতে নাচতে দূরে সরে গেল। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে চলে গেল ঝুল-বারান্দায়, সেখান থেকে রেইলিং টপকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে নিচে। জ্ঞান হারাবার আগে বমি পাচ্ছে রানার, এখনও তাকিয়ে আছে ছায়ামূর্তির দিকে। লোহার রেইলিঙের মাথায় ধবধবে সাদা হাত দেখতে পেল, আঙুলগুলো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে রেইলিং। হাত ছেড়ে দিল লোকটা, ঝপ করে খসে পড়ল হোটেলের পার্কিং এরিয়ায়। অন্ধকার গ্রাস করল রানাকে।

জ্ঞান ফেরার পর রানা দেখল, মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে ও, মাথায় অসহ্য ব্যথা, ঘরের ভেতর পুলিস। বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে মাথার ব্যথাটা অগ্রাহ্য করে যে-ই উঠে বসতে যাবে, অমনি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ইউনিফর্ম পরা দু'জন পুলিস নড়ে উঠল—একজন এক পা পিছিয়ে গেল, অপরজন

বুট দিয়ে খোঁচা মারল রানার পাঁজরে। অপমানটা নিঃশব্দে হজম করল ও। কিন্তু বুটটা আবার এগিয়ে আসছে দেখে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল পা, ধরেই ঠেলে দিল সামনের দিকে। দেয়াল ধরে তাল সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল লোকটা, দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে। পরমুহূর্তে এক লাফে সিধে হলো, বেল্ট থেকে অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে বেয়োনেট। রানা যেই দাঁড়িয়েছে, দ্বিতীয় পুলিসটা সরে এসে ওর গায়ে গা ঠেকাল, হাতের রিভলভার পাঁজরে ডেবে যাচ্ছে।

তীক্ষ্ণ একটা গলা শুনে ঘাড় ফেরাল রানা। সিভিলিয়ান লোকটাকে এই প্রথম দেখল। শক্ত-সমর্থ, দীর্ঘদেহী মানুষ; আর্মচেয়ারে বসে আছে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওকে, নীল রেইনকোট পরে আছে, হাত জোড়া বুকের ওপর ভাঁজ করা। 'যুগোস্লাভিয়ায় কেউ যদি গ্রেফতার এড়াবার চেষ্টা করে, আমাদের আইনে তাকে গুলি করার অনুমতি দেয়া আছে। শুধু আমি নিষেধ করায় এখনও অফিসাররা আপনাকে মেরে ফেলেনি।'

'গ্রেফতার?' গলায় দৃঢ়তা আনার চেষ্টা করল রানা। চোখে এখনও ঝাপসা দেখছে, লোকটার চেহারা পরিষ্কার হচ্ছে না। 'কেন?'

লোকটা মাথা নাড়ল, নাকি দৃষ্টিভ্রম, ঠিক বোঝা গেল না। তবে ঝাড়বাতির আলো লেগে ঝিক্ করে উঠল চোখের চশমা। ঘাড় ফেরাতে লাশটা দেখতে পেল রানা--শরীরের অর্ধেকটা ওর বিছানার ওপর, ভাঁজ করা হাঁটু সহ বাকি অংশ মেঝেতে, লোকটা যেন নামাজ পড়ার সময় খুন হয়েছে। সাদাটে জিনসের ট্রাউজার আর শার্ট পরনে, পায়ের কেডস জোড়া পুরানো ও কাদামাখা। চোখের চশমা আবার ঝিক করে উঠল। খাপের ভেতর বেয়োনেটটা ভরে নিয়ে সেই পুলিস লোকটা আবার এগিয়ে এল। বুট দিয়ে লাথি মারল লাশের গায়ে, কিন্তু তাকিয়ে আছে রানার চোখের দিকে।

লাশের মাথা থেকে ক্যাপটা খসে পড়ল। বিস্মিত হলো রানা, সেই সঙ্গে বেদনায় টনটন করে উঠল বুকটা। লোক নয়, খুন হয়েছে একটা কিশোর--টেনেটুনে ষোলো বছর বয়স হবে। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা, এখনও ভাল করে দাড়ি-গোঁফ গজায়নি, খোলা কালো চোখ স্থির হয়ে আছে ঝাড়বাতির দিকে। দুর্বল, অসুস্থবোধ করল রানা; মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরল, ভয় পাচ্ছে আবার না জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

আর্মচেয়ার থেকে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে জানতে চাইল লোকটা, 'ওকে আপনি চেনেন?'

ঘাড় ফিরিয়ে আবার তার দিকে তাকাতে চশমার আকৃতিটা অদ্ভুত লাগল রানার। লোকটা ইউনিফর্ম পরেনি, সুটের ওপর নীল রেইনকোট চাপিয়েছে। কথা না বলে রানা শুধু কাঁধ ঝাঁকাল।

'ওর নাম আলভিক নুরানিক, মি. রানা।'

রানা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল নাম দুটো সে জানল কিভাবে? তার আগেই লোকটা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিল পুলিস দু'জনকে। বিছানার চাদর দিয়ে লাশটা মুড়ল তারা, ধরাধরি করে দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। দু'জনেই এত কম নড়াচড়া করল, সন্দেহ নেই এ-ধরনের কাজে তারা

অভ্যস্ত।

চেয়ারটায় আবার বসে একটা চুরুট ধরাল লোকটা। 'এবার বলুন, মি. রানা, যুগোস্লাভিয়ায় আপনি কি করছেন।'

কথা না বলে ক্লান্ত পায়ে খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর সামনে এসে দাঁড়াল রানা। নিচে প্রচুর গাছপালা, তারই মধ্যে পার্কিং এরিয়া। আলো আছে, তবে যথেষ্ট নয়। হাতঘড়ির উপর চোখ বোলাল একবার। রাত দুটো। রানার এই স্যুইট দোতলায়, ঝুল-বারান্দার রেইলিং থেকে নিচের পার্কিং এরিয়ায় নেমে যেতে তালগাছের মত লম্বা ছায়ামূর্তির কোন অসুবিধেই হয়নি। সেরকম কোন লোককে কি সত্যি দেখেছে ও? দৃষ্টিভ্রম বা দুঃস্বপ্ন নয়তো? ঘাড় ফিরিয়ে বিছানার দিকে তাকাল রানা। তোষকে রক্তের দাগ দেখতে পেল, ওর হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে।

'আপনি বরং গায়ে ড্রেসিং গাউনটা পরে পায়ে স্লিপার গলান, মি. রানা,' বলল লোকটা। 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।'

পিছিয়ে এসে ড্রেসিং গাউনটা পরল রানা। কিন্তু স্লিপার জোড়া কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। ওগুলো সম্ভবত কারও পায়ের ধাক্কায় খাটের তলায় সরে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে খোঁজার ইচ্ছে হলো না। উদ্ভট বা আনাড়ি মনে হয় এমন কিছু করতে এই মুহূর্তে রাজিও নয়।

'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেননি,' বলল লোকটা। 'যুগোস্লাভিয়ায় কেন এসেছেন?'

'আমি একজন প্রকাশক। এখানকার···'

'প্রকাশক? আচ্ছা! তা কি প্রকাশ করেন, মি. রানা? এক দেশের গোপন তথ্য চুরি করেন, তারপর আরেক দেশে নিয়ে গিয়ে বেচে দেন?'

'আমি একটা প্রতিষ্ঠিত পাবলিশিং হাউসের মালিক,' বলল রানা। 'আমার প্রকাশনা সংস্থার হেড অফিস লন্ডনে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, এমন সব কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিকের লেখা ছাপি।'

'পাসপোর্টে আপনাকে প্রকাশকই বলা হয়েছে, কিন্তু সেটাই কি আপনার আসল পরিচয়?'

চোখ সরু করে লোকটার দিকে তাকাল রানা।

'এতে অবাক হবার কিছু নেই,' আবার বলল লোকটা। 'লাশটা পাবার পর আপনার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চেয়েছি আমরা। পাসপোর্টটা হোটেল ম্যানেজারের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। আপনি বৈধ ভিসা নিয়েই যুগোস্লাভিয়ায় এসেছেন, তবে পাসপোর্টে দেয়া সব তথ্য সত্যি কিনা তা একমাত্র আপনিই বলতে পারবেন।'

'আপনারা খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন আমি সত্যি একজন প্রকাশক কিনা।'

'হ্যাঁ, খোঁজ তো অবশ্যই নেয়া হবে,' কঠিন সুরে বলল লোকটা। 'লন্ডনে আমাদের লোক আছে। শুধু পরিচয় নয়, আরও অনেক বিষয়ে খোঁজ নেয়া হবে। আপনাকে যে-সব প্রশ্ন করা হবে তার উত্তর সঠিক না হলে আমরা জানতে পারব। কাজেই, সাবধান, মি. রানা।'

'উত্তর দেয়ার আগে আমাকে জানতে হবে, আপনি কে। তারপর আপনাকেও আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।' লোকটার দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে রানা।

লোকটা তার পকেট থেকে রানার ওয়ালেট, নোটবুক, কয়েক প্রস্থ পরিচয়-পত্র বের করে সামনের নিচু টেবিলে রাখল। 'এগুলোও পরীক্ষা করতে হয়েছে।' আরেক পকেট থেকে নিজের ওয়ালেটটা বের করল, তা থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'আমার কার্ড।'

ভিজিটিং কার্ডের বাঁ দিকে লেখা রয়েছে—ড. দেবারভিল সিডাক। ডান দিকে ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর। পেশা সম্পর্কে কোন তথ্য নেই।

'আমি,' রানা মুখ তুলতে বলল লোকটা, 'পুলিস বিভাগে আছি।'

'কিন্তু ইউনিফর্ম?'

'সিক্রেট পুলিসের চীফকে ইউনিফর্ম পরতে হয় না।'

'ও। কিন্তু ডক্টর মানে? আপনি কি চিকিৎসাও করেন?'

'না।' চুরুটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে জবাব দিলেন বেলগ্রেড পুলিস চীফ। আপনমনে হাসছেন, বয়েস তাতে বেশ কিছুটা কমে পঞ্চাশে নেমে এল। 'ভিয়েনার পুবে ইউনিভার্সিটির যে-কোন গ্র্যাজুয়েটকে ডক্টর বলা হয়। আমার সাবজেক্ট ছিল আইন।' হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুললেন। সার্ব-ক্রোট ভাষায় দ্রুত কয়েকটা কথা বলে তাকালেন রানার দিকে। 'আপনি সরাসরি জার্মানী থেকে এখানে আসছেন?'

'হ্যাঁ, ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে।'

'ফ্রাঙ্কফুর্টে কেন গিয়েছিলেন?'

'ওখানকার বাৎসরিক বইমেলা আর পাবলিশারদের কনফারেন্সে যোগ দিতে।'

'এখানে কেন এসেছেন?'

'যুগোস্লাভিয়ায় নামকরা অনেক লেখক-সাহিত্যিক আছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলব। কেউ যদি লন্ডন থেকে কিছু ছাপাতে চান, আমি তার ব্যবস্থা করব।'

'বিশেষ কারও কথা ভাবছেন নাকি?' সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলেন সিডাক।

মাথা নাড়ল রানা। 'আপনাদের লেখক বা লেখালেখি সম্পর্কে আমার তেমন পরিষ্কার ধারণা নেই। তবে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে কয়েকজনের নাম বলা হয়েছে আমাকে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'কাদের নাম বলা হয়েছে?'

হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে নোটবুকটা নিল রানা। পাতা ওল্টাচ্ছে। 'স্টিফান তাজিনোভা, ইভানো গার্দিস, সাঈদ মুর্তজায়েভ, অদ্রে ডিয়াব···' থেমে মুখ তুলল রানা। 'নাম তো অনেকগুলোই, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে এখানকার লেখক সংঘের অনুমতি নিতে হবে।'

'তার আগে লেখক সংঘকে পেতে হবে পুলিস বিভাগের অনুমতি,' পুলিস চীফ বললেন। 'ফ্রাঙ্কফুর্টের কারা আপনাকে এই নামগুলো দিল? তারা সবাই কি জার্মান?'

'দু'একজন,' বলল রানা. 'সবাই নয়। দু'জন ফ্রেঞ্চ, একজন ইটালিয়ান আর একজন ইংরেজও ছিল। কেন?'

'তাদের মধ্যে সাঈদ মুর্তজায়েভের নামটা কে বলল আপনাকে?'

আলভিক নুরানিকের রুদ্ধশ্বাস ফিসফিসানি এখনও রানার কানে লেগে রয়েছে—'আমাকে মুর্তজা সাহেব পাঠিয়েছেন।' নোটবুক খুলে আবার চোখ বোলাবার ভান করল ও। 'সাঈদ···সাঈদ···হ্যাঁ, সাঈদ মুর্তজায়েভ।' পুলিশ চীফের দিকে তাকাল। 'এখানে শুধু নামটাই আছে, কে জানিয়েছে তা তো লিখে রাখিনি।'

'আপনাকে বিশেষভাবে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কই, না, সেরকম কিছু আমার মনে পড়ছে না।'

'উনি কিছু লিখছেন কিনা জানি না, তবে বহু বছর হলো তাঁর কোন লেখা ছাপা-টাপা হচ্ছে না—সেই ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর থেকে।'

আবার নোটবুকে চোখ বোলাল রানা, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি আপনাদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট?'

'নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু শপথ নিতে পারেননি,' খুব নরম সুরে কথা বলছেন রাজধানীর পুলিস চীফ। 'রাজনৈতিক কারণে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। এ-সব আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, বিস্তারিত জানতে চেষ্টা করে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না, প্লীজ। আমার ধারণা, তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হবে না।'

'দেখা না হলে দুঃখ পাব,' বলল রানা। 'শুনেছি বিরল একটা প্রতিভা, কবি ও দার্শনিক হিসেবে খুব নাম···'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন দেবারভিল সিডাক, 'সাঈদ মুর্তজায়েভ যে বিরল প্রতিভা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

দরজায় নক হলো। পুলিস চীফ অনুমতি দিতে মধ্যবয়স্কা এক চেম্বারমেইডকে নিয়ে হোটেলের নাইট পোর্টার ঢুকল বেডরূমে। মহিলা সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে, এক হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে, অপর হাতের ভাঁজে একজোড়া চাদর। তোষকের ওপরও রক্ত লেগে রয়েছে দেখে কামরা থেকে আবার বেরিয়ে গেল নাইট পোর্টার। একটু পর আরও দু'জন লোককে নিয়ে ফিরে এল সে, ধরাধরি করে একটা নতুন তোষক নিয়ে এল তারা। বিছানার তোষক বদলের পর অতিরিক্ত লোক দু'জন চলে গেল। একপাশে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে নাইট পোর্টার, চেম্বারমেইড বিছানায় চাদর বিছাচ্ছে। দু'জনের কেউই পুলিস চীফ বা রানার দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না। ড. সিডাক নিঃশব্দে মহিলার কাজ দেখছেন, কথা বলছেন না। রানা বুঝতে পারল, হোটেল কর্মচারীদের সামনে রানার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক নন তিনি। ভালই হলো, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার সময় পাচ্ছে ও।

বেলগ্রেডের সিটি শেরাটন হোটেলে রানা বিদেশী একজন বোর্ডার, ওর কামরায় কেউ খুন হলে সঙ্গত কারণে ওকেই প্রথমে সন্দেহ করা হবে। কয়েকজন পুলিসকে নিয়ে একজন ইন্সপেক্টর তদন্ত করতে আসবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু

ইন্সপেক্টরের বদলে স্বয়ং পুলিস চীফ হাজির হওয়ায় বোঝা যাচ্ছে কেসটাকে সাধারণ একটা মার্ডার কেস হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে না। সবাই জানে যুগোস্লাভিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। এখানে নানা দেশের স্পাইরা তৎপর। বসনিয়ান মুসলিম গেরিলারা মন্ত্রী-মিনিস্টারদের হত্যা করার জন্যে সুইসাইড মিশন নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু যুগোস্লাভিয়া নয়, গোটা বলকান এলাকাই বারুদ হয়ে আছে। ন্যাটো কসোভোয় বোমাবর্ষণ করার পর জাতিগত বিরোধের একটা রাজনৈতিক মীমাংসা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষই সন্তুষ্ট নয়। বসনিয়ান মুসলমানদের আত্মঘাতী বোমায় বেলগ্রেডের মেয়র সহ একজন প্রতিমন্ত্রী খুন হয়েছে গত মাসে। তার দু'দিন পরই ক্রোট দাঙ্গাবাজরা বেলগ্রেডের দুটো শপিং মলে আগুন ধরিয়ে দেয়ায় নিহত হয়েছে পঞ্চাশজন। এক সময় এক সারি পাহাড়ের নাম ছিল বলকান, সেই বলকান বলতে এখন বোঝায় দক্ষিণ-পুব ইউরোপের বিশাল অববাহিকা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, জাতিগত বিদ্বেষ, পাইকারী হত্যাকাণ্ড—বলকান আর অভিশাপ সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলকানদের রক্তপিপাসা সম্পর্কে কে না জানে! পরস্পরকে ঘৃণা করার প্রতিযোগিতায় চিরকালই তারা অক্লান্ত। তাদের আহাম্মকি দুনিয়াটাকে বেশ কয়েকবার ঝাঁকি দিয়েছে। বলকানের নিয়ম হলো জোর যার মুল্লুক তার। পছন্দ না হলে তোমাকে বন্দী করা হবে, কথায় না বনলে হত্যা।

রানা সতর্ক, তবে ভয় পাচ্ছে না। বিপদ আছে জেনেই যুগোস্লাভিয়ায় ঢুকেছে ও।

চেম্বারমেইড দ্রুত কাজ সারল। বিছানাটা দেখে এখন আর কারও মনে হবে না আলভিক নুরানিক এখানে খুন হয়েছে। তোষক পাল্টাবার সময় খাটটা একটু সরানো হয়েছে, কার্পেটের ওপর স্লিপার জোড়া দেখতে পাচ্ছে রানা। এগিয়ে এসে ওগুলোয় পা গলাতে যাচ্ছে, কিন্তু ডান পা পুরোপুরি ভেতরে ঢুকছে না। দ্বিতীয়বার জোরে চেষ্টা করায় ঢুকল বটে, কিন্তু টের পেল আঙুলের ফাঁকে কি যেন একটা আটকে গেছে। আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে বোঝার চেষ্টা করল জিনিসটা কি, কিন্তু লাভ হলো না।

ব্যাঙের চোখের পাতার মত লাফালাফি করছে পোর্টারের চোয়াল। মহিলাটি এখনও চোখ রগড়াচ্ছে। কাজ শেষ, পিছু হটার সময় মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাচ্ছে পুলিস চীফকে, যদিও ড. সিডাক ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল তারা, রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করছে মহিলা, রানা লক্ষ করল মহিলার একটা চোখ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে আবার খুলে গেল। ঝট করে পায়ের আঙুলে আটকে থাকা জিনিসটার কথা মনে পড়ে গেল রানার। মহিলার চোখ-ইশারার সঙ্গে ওটার কি কোন সম্পর্ক আছে?

বাঘের গর্জন শুনে চমকে উঠল রানা। ড. সিডাক হুঙ্কার ছেড়ে চেম্বারমেইড ও পোর্টারকে ঘরে ফিরে আসার হুকুম করলেন। দরজা আবার খুলে গেল। মহিলা কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে ঢুকল, পেছনে পোর্টার। রানা খানিকটা হতভম্ব—দরজার

দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভদ্রলোক, তাঁর পক্ষে কি মহিলার চোখ বন্ধ করা দেখতে পাওয়া সম্ভব? তারপর, হঠাৎ বুঝতে পারল চশমা জোড়া কেন এতক্ষণ অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। চশমার দু'দিকে দুটো সাইড প্যানেল আছে, ওগুলোর সাহায্যে চোখের কোণ দিয়ে পিছনের দৃশ্যও দেখতে পান ড. সিডাক। চশমার বর্ধিত অংশের কারণে আলোও ঘনঘন প্রতিফলিত হয়। কোনও সন্দেহ নেই, চেম্বারমেইডের ওপর নজর রাখছিলেন তিনি। কিন্তু কেন?

অসহ্য ধীরগতিতে ছুরি চালানোর ভঙ্গিতে কথা বলছেন ড. সিডাক। হতবিহ্বল পোর্টার শুধু কাঁপছে, কথা বলতে পারছে না। চেম্বারমেইডের চেহারা থমথমে হয়ে উঠল। সে-ও কথা বলছে না, শুধু মাথা নাড়ছে। পুলিস চীফ আবার তাকে প্রশ্ন করলেন, এবারও শুধু মাথা নাড়ল মহিলা, পুলিস চীফের জুতোর দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের দিকে পিছন ফিরে রানার মুখোমুখি হলেন ভদ্রলোক। 'মি. রানা, মেয়েলোকটা কি আপনাকে চোখ টিপল?'

'চোখ টিপল?' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল রানা। 'কই, না তো। আমি শুধু দেখলাম উনি চোখ রগড়াচ্ছেন। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসেছেন, চোখ মিটমিট করতে পারেন, টিপবেন কেন?'

'ধন্যবাদ, মি. রানা,' নরম সুরে বললেন পুলিস চীফ। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল তাঁর শরীরে। বন করে আধ পাক ঘুরেই মহিলার পায়ের পাতা থেঁতলে দিলেন ডান পায়ের জুতো দিয়ে। আর্তনাদ শোনা গেল। রানা আন্দাজ করল, মহিলার পায়ের অন্তত পাঁচ-ছটা হাড় ভেঙে গেছে। কার্পেটে শুয়ে ব্যথায় ছটফট করছে সে। তাকে সাহায্য করা দরকার, কিন্তু মনস্থির করতে এক সেকেন্ড দেরি করে ফেলল রানা। মহিলাকে ধরে তোলার জন্যে যেই পা বাড়িয়েছে, ড. সিডাক কাঁধের ধাক্কায় একপাশে সরিয়ে দিল ওকে। 'না, মি. রানা। আপনার নাক গলানোটা বোকামি হবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল রানা।

'উঠে বসো!' মহিলাকে নির্দেশ দিলেন পুলিস চীফ।

এক হাঁটুর ওপর খানিকটা সিধে হলো মহিলা, দু'হাতে আহত পা ধরে আছে। রেইনকোটের পকেট থেকে একজোড়া গ্লাভস বের করলেন ড. সিডাক, শুয়োরের চামড়া দিয়ে তৈরি। গ্লাভস পরে মহিলার গালে থাপ্পড় মারলেন। একবার মারার পর কিছুক্ষণ থেমে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর আবার মারলেন। এভাবে চলতেই থাকল। খুব যে জোরে আঘাত করছেন তা নয়, তবু মহিলার ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়াতে শুরু করল। ফোঁপাচ্ছে সে, কিন্তু এখনও কিছু বলছে না। রানা খেয়াল করল, একবারও সে ড. সিডাক বা ওর দিকে তাকায়নি।

সাত-আটটা চড় মারার পর থামলেন ড. সিডাক। ইতিমধ্যে পুলিস দু'জন দোরগোড়ায় ফিরে এসেছে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, যেন জমে পাথর হয়ে গেছে। অবশেষে আবার ঝিক্ করে উঠল পুলিস চীফের চশমার কাঁচ। ইঙ্গিত পেয়ে পোর্টার এগিয়ে এসে মহিলাকে ধরে তুলল, সাহায্য করল কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে। তাকে খোঁড়াতে দেখে রানার বুকটা টনটন করে উঠল। ওকে কিছু একটা বলার ঝুঁকি নেয়াতেই বেচারির এই ভোগান্তি।

কামরার ভেতর পায়চারি শুরু করলেন ড. সিডাক। মাথাটা দপদপ করছে, সদ্য তৈরি বিছানায় বসে পড়ল রানা। প্রায় মিনিট তিনেক পর আবার সেই আর্মচেয়ারে বসলেন পুলিস চীফ। 'ব্যাপারটা আপনার পছন্দ হয়নি, তাই না, মি. রানা?' অস্বাভাবিক চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বললেন, 'পছন্দ আমারও হয়নি।'

রানার চোয়াল দুটো শক্ত হলো।

'তাহলে কাজটা আমি করলাম কেন?' চোখ থেকে চশমা খুলে আঙুল দিয়ে কপালটা টিপে ধরলেন ড. সিডাক। 'এদেশের লোকজনকে আপনি চেনেন না, মি. রানা। তারা বুনো, আদিম, হিংস্র। আইন না মানার প্রবণতা নিয়েই তারা বড় হয়। কোন কারণ ছাড়াই খুনোখুনি করে। কারণ যে নেই, তা-ও কিন্তু নয়। এদেশে কারা বসবাস করে জানেন? ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠির সংখ্যা এত বেশি, গুনে শেষ করতে পারবেন না। জাতপাত নিয়ে হরদম দাঙ্গা-ফ্যাসাদ লেগে আছে। এ স্রেফ নরক, মি. রানা। একটা আইনকেই ওরা ভয় পায়, বুঝলেন। সেটা হলো নির্যাতন। সেজন্যেই ওদেরকে লাথি মারি আমরা, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হাড়গোড় ভাঙি, প্রয়োজনে গুলিও করি।'

'কোন রকম বাছবিচার না করেই? নিরপরাধ লোকজনকেও?'

'নিরপরাধ? মি. রানা, এদেশে নিরপরাধ বলে কেউ নেই। সবাই যে যার নিজের খেয়াল-খুশি মত চলতে চায়। তা চলার অনুমতি দিলে সমাজ টিকবে না। মি. রানা, আপনি কি সম্রাট ব্যাসিল সম্পর্কে জানেন? এগারো শতাব্দীতে বিখ্যানটাইন গ্রীক সম্রাট ছিলেন? আমাদের প্রতিবেশী বুলগেরিয়ানরাও কম হিংস্র নয়, সম্রাট ব্যাসিল তাদেরকে পরাজিত করেন। যুদ্ধে অনেক যোদ্ধা বন্দী হয়। সম্রাট ব্যাসিল দশ হাজার সৈন্যকে বুলগেরিয়ার রাজার কাছে ফেরত পাঠান। কি দয়া, তাই না? কিন্তু না! ব্যাসিল একজন বাদে দশ হাজার সৈন্যকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন, ওই একজন বাকি সবাইকে পথ দেখিয়ে রাজার কাছে ফিরিয়ে আনে। বলা হয়, সৈন্যদের দেখে হৃদরোগে আক্রান্ত হন রাজা, এবং মারা যান। এই যে শোকে তিনি মারা গেলেন, এটা আমার কাছে আশ্চর্য লাগে। কারণ তাঁর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে যে-সব কাহিনী প্রচলিত আছে, কোন কাজে লাগবে না ভেবে ওই দশ হাজার সৈন্যকে তিনি মেরে ফেললে স্বাভাবিক ও মানানসই হত।'

'আমি ঠিক এভাবে শুনিনি,' বলল রানা। 'ব্যাসিল প্রতি একশোজনের মধ্যে নিরানব্বুইজনকে অন্ধ করেছিলেন, বাকি লোকটা যাতে পথ দেখিয়ে তাদেরকে নিয়ে যেতে পারে। তারও মাত্র একটা চোখ অক্ষত রাখা হয়েছিল।'

'আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে আপনার দেখা যাচ্ছে ভালই ধারণা আছে, মি. রানা,' বললেন ড. সিডাক। 'আমাদের গল্পে-সাহিত্যে, লোকগীতিতে, কবিতায়, ছবিতে একটা জিনিসই শুধু দেখতে পাবেন—রক্তপাত, হিংস্রতা, খুনোখুনি। এই বিষ আমাদের রক্তে মিশে আছে। একটা দুরারোগ্য ব্যাধি, মি. রানা।'

রানা বড় করে শ্বাস টেনে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল। 'আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে, ড. সিডাক।'

'বলুন।'

'হোটেলের চারদিকে সশস্ত্র পুলিস পাহারা দিচ্ছে, ভেতরেও কয়েকজনকে টহল দিতে দেখেছি,' বলল রানা। 'একজন ট্যুরিস্ট এরকম কড়াকড়ি দেখে স্বভাবতই নিরাপদ বোধ করবে। আমিও করেছিলাম। সেজন্যেই ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর কবাট বন্ধ করে শুইনি। আমার প্রশ্ন হলো, এতগুলো পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঝুল-বারান্দা হয়ে দু'দু'জন লোক কিভাবে ঢুকল আমার কামরায়?'

'সব দেশের পুলিসই ঘুষ খায়, মি. রানা।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পুলিস চীফ, চোখে চশমা পরছেন। 'তাদের ওপর রাজনৈতিক চাপও থাকে, কেউ অনুরোধ করলে বা নির্দেশ দিলে ফেলতে পারে না।'

রানা কিছু বলতে যাবে, হাত তুলে থামিয়ে দিলেন পুলিস চীফ।

'আজ দুপুর আড়াইটায়, মি. রানা, আমার সঙ্গে আপনি দেখা করবেন, প্লীজ,' বললেন তিনি, রানাকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে এগোলেন। তাঁর পিছু নিয়ে দরজা পর্যন্ত যাচ্ছে রানা। ইচ্ছে করেই, জানে পুলিস চীফ চশমার সাইড প্যানেল দিয়ে ওকে লক্ষ করছেন, নাক দিয়ে ভদ্রলোকের কাঁধে গুঁতো মারার ভঙ্গি করল ও। দায়িত্বজ্ঞানহীন, ছেলেমানুষি আচরণ, সন্দেহ নেই; তবু নিজেকে রানা দমন করতে পারেনি। ভদ্রলোকের কাঁধ জোড়া আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখে অদ্ভুত একটা তৃপ্তিবোধ করল ও। আধ পাক ঘুরে ওর মুখোমুখি হলেন ড. সিডাক।

'স্রেফ একটা জোক, ড. সিডাক। বোঝাতে চেয়েছি, আপনার চশমার বর্ধিত অংশটুকু আমাকে মুগ্ধ করেছে।'

পুলিস চীফ ড. সিডাকের রাগ পানি হয়ে গেল, তাঁর হাসি দেখে মনে হলো শিক্ষকের প্রশংসা শুনে প্রিয় ছাত্র আহ্লাদ বোধ করছে। 'খুব কাজের জিনিস, কি বলেন?'

'কি জানি, আমার সন্দেহ আছে,' বলল রানা। 'এক লোককে চিনতাম, সে-ও এ-ধরনের চশমা পরত। পরিণতি মোটেও ভাল হয়নি।'

'কেন? কি ঘটেছিল?'

'চশমার সাহায্যে দেখা যায় বলে লোকটা বারবার শুধু পিছনটাই দেখত,' বলল রানা। 'ফলে একজন তাকে সামনে থেকে পেটে গুলি করে।'

পরিবেশ নিস্তব্ধ ও আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

ড. সিডাকই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন। মাথা নিচু করে ছিলেন, চোখ তুলে রানার দিকে তাকালেন। 'আপনি আশ্চর্য একজন মানুষ দেখছি, মি. রানা। গুড নাইট। আশা করি বাকি রাতটুকু নিরুপদ্রবেই ঘুমাতে পারবেন।'

'গুড নাইট, ড. সিডাক।'

দরজা ও ফ্রেঞ্চ উইন্ডো বন্ধ করে দুটো পেইনকিলার ট্যাবলেট খেলো রানা, তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল বিছানায়। মাথাব্যথা কমে আসতে ডান পা থেকে স্লিপারটা খুলল, আঙুলের ফাঁক থেকে বের করে আনল খুদে ও প্রায় গোলাকার একটা বস্তু। চুল, ঝুল, দেশলাইয়ের ভাঙা কাঠি, সুতো, তুলো, দু'এক চিলতে রাঙতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি জিনিসটা—আবর্জনার সমষ্টি, দেখে কারও কিছু সন্দেহ হবে না, লুকিয়ে রাখা সহজ, ফেলে দিতেও সমস্যা নেই। দু'আঙুলে ধরে ওটাকে ঝাঁকাল রানা, ভেতর থেকে ভাঁজ করা চৌকো একটা কাগজ পড়ল

কার্পেটে। খোলার পর দেখা গেল ইংরেজিতে লেখা একটা চিঠি। চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই, তবে নিচে প্রেরকের নাম আছে।

'চেষ্টা করে দেখুন আমার সঙ্গে দেখা করার সরকারী অনুমতি পাওয়া যায় কিনা। অযথা কোন ঝুঁকি নেবেন না, প্লীজ। পত্রবাহক আমার বিশ্বস্ত, কিছু বলার থাকলে নির্দ্বিধায় তাকে বলতে পারেন। তবে লিখিত কিছু দেবেন না ওকে। এই কাগজটাও পুড়িয়ে ফেলুন। সরকারী অনুমতি পাওয়া না গেলে আমার লোক আবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। শুভেচ্ছা, সাঈদ মুর্তজায়েভ।'

অ্যাশট্রেতে ফেলে চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলল রানা। আলো নিভিয়ে বিছানায় উঠল বটে, কিন্তু ঘুম আসছে না। বেলগ্রেডের পুলিস প্রধান নিজেই স্বীকার করেছেন, কারও অনুরোধে বা নির্দেশে আলভিক নুরানিককে ওর স্যুইটে ঢুকতে দিয়েছে প্রহরী পুলিসরা। আর অপর লোকটি যে-ই হোক, নুরানিককে খুন করে যখন চলে যাচ্ছে, তখন তাকেও বাধা দেয়নি তারা। অর্থাৎ ড. সিডাক স্বীকার করে গেলেন, পুলিসের ওপর তাঁর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রশ্ন হলো, কে সে, পুলিস যার কথায় নাচে?

ঝট্ করে একজনের নাম মনে পড়ল রানার। সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল ওর। লোকটা সম্পর্কে জানে ও, তার ডোশিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়েছে। কার্চিক জোড়া রক্ত-মাংসের তৈরি নির্ভীক এক কিলিং মেশিন। তালগাছের মত লম্বা...হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, ওর স্যুইটে ঢুকে নুরানিককে সে-ই খুন করে গেছে।

রানার মন ঢাকায় ফিরে গেল। আজ যা ঘটল তার সূচনাপর্ব ওখান থেকেই শুরু হয়। কে জানে এর শেষ কোথায়!

দুই

ঢাকা, বিসিআই হেডকোয়ার্টার।

ছয় ও সাত, দুটো ফ্লোরেই আশ্চর্য এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। লাঞ্চের এই সময়টায় এজেন্টদের কামরা থেকে সুন্দরী প্রাইভেট সেক্রেটারিদের রিনিঝিনি হাসির আওয়াজ ভেসে আসে, কিন্তু ওদের কামরাগুলো আজ বন্ধ, ভেতরে কেউ নেই। প্রতিটি করিডর ফাঁকা। কোথাও কোন ইন্টারকম বাজছে না।

থাকার মধ্যে আছে শুধু টেকনিশিয়ানরা, সাউন্ডপ্রুফ কমিউনিকেশন রুমে সবাই তারা অত্যন্ত ব্যস্ত। দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তিটি একদিনের জন্যে সরকারী সফরে ঢাকায় এসেছেন, তাঁর অবস্থান, সম্ভাব্য গন্তব্যস্থান ও সংশ্লিষ্ট এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা মনিটরিং করছে তারা।

কমিউনিকেশন রুমের সমস্ত তথ্য সরাসরি মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের চেম্বারে চলে আসছে। ডেস্ক ও রিভলভিং চেয়ারের ডান দিকে এক সারিতে সাতটা মনিটর বসানো হয়েছে, প্রতিটি স্ক্রীনে আলাদা দৃশ্য—মার্কিন

দূতাবাস, সোনারগাঁও হোটেল, রাষ্ট্রীয় অতিথিভবন, সেনাবাহিনী প্রধানের দফতর, গণভবন ইত্যাদি। চেম্বারে রানাও উপস্থিত।

বিসিআই এজেন্টরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ছড়িয়ে আছে, কানে হেডফোন লাগিয়ে সরাসরি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে রানা। হেডফোনের সঙ্গে মাউথপীসও আছে, মাঝে মধ্যে দু'একটা নির্দেশও দিচ্ছে ও। রাহাত খানের মত ওর চোখও ঘুরে বেড়াচ্ছে সাতটা মনিটর স্ক্রীনে।

অকস্মাৎ রানার শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। মাউথপীসে হাতচাপা দিয়ে বসের দিকে তাকাল ও, কথা বলার আগে একটা ঢোক গিলল। 'স্যার, খারাপ খবর! মেডিলিন অলব্রাইটকে পাওয়া যাচ্ছে না!'

এক সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন রাহাত খান। 'হোয়াট?'

'কনফার্মড্ নিউজ, স্যার,' বলল রানা, এরইমধ্যে ঘামতে শুরু করেছে হাতের তালু। 'উনি আমেরিকান দূতাবাসে ছিলেন, কিন্তু লাঞ্চের সময় তাঁকে টেবিলে না দেখে সিআইএ এজেন্টরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারে, মেডিলিন অলব্রাইট দূতাবাসের কোথাও নেই!'

রাহাত খান যেন একটা রোবট, এক চুল নড়লেন না। 'অ্যাবসার্ড!'

'খোদ সিআইএ এজেন্টরাই আমাদের লোকজনকে এ খবরটা জানিয়েছে,' বলল রানা, উত্তেজনায় ও উদ্বেগে গলাটা কেঁপে গেল। 'ওরা বলছে, দূতাবাসে অনেক গাড়ি আসা-যাওয়া করছে, প্রতিটি গাড়ি চেক না করে ছাড়া হচ্ছে না; অথচ সিকিউরিটি গার্ডরা একবাক্যে বলছে তারা ওঁকে দূতাবাস থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি।'

'একা শুধু অলব্রাইটকে পাওয়া যাচ্ছে না?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান। তিনি বিচলিত নন, তবে নির্লিপ্তও বলা যাবে না।

'না—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল আফতাব ওঁদের দূতাবাসে ছিলেন, তাঁকেও পাওয়া যাচ্ছে না।'

'মেজর জেনারেল আফতাব? জন সি হোলজম্যানের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক আছে তাঁর,' বললেন রাহাত খান। 'উনি সম্ভবত রাষ্ট্রদূতের ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবেই আজ দূতাবাসে গিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করো, মেজর জেনারেল কি সিভিল ড্রেসে ছিলেন?'

একটা মনিটরে বিসিআই-এর একজন এজেন্টকে দেখা যাচ্ছে, মাউথপীস থেকে হাত সরিয়ে তার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলল রানা, তারপর বসকে জানাল, 'না, উনি ইউনিফর্ম পরেই ছিলেন।'

'কতক্ষণ হলো ওঁদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'সিআইএ তিন মিনিট আগে খবরটা দিয়েছে,' বলল রানা। 'মেডিলিন অলব্রাইটকে শেষবার দেখা গেছে সতেরো মিনিট আগে। স্যার, মেজর আফতাব কি...?'

রানা প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না, রাহাত খান মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন। ডেস্ক থেকে মোবাইল ফোনটা তুলে নিয়ে দ্রুত ডায়াল করলেন। 'মি. হোলজম্যান? আমি রাহাত খান। কি ব্যাপার বলুন তো?'

অপরপ্রান্তে জন সি হোলজম্যান কি বলছেন রানা শুনতে পাচ্ছে না। এক মিনিট পর রাহাত খান বললেন, 'ধন্যবাদ।' রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে তাকালেন। 'আতঙ্কিত হবার কিছু নেই,' বললেন তিনি। 'মেডিলিন তাঁর কামরায় একটা নোট রেখে গেছেন। এক মিনিট আগে পাওয়া গেছে সেটা। মেডিলিন তাতে লিখেছেন, মেজর জেনারেল আফতাবের সঙ্গে তিনি একটু বাইরে যাচ্ছেন, কাজেই কেউ যেন উদ্বিগ্ন না হয়। বলেছেন, এক ঘণ্টার মধ্যে দূতাবাসে ফিরে আসবেন।'

'প্রটোকল, সিকিউরিটি ছাড়াই তিনি বেরিয়ে পড়লেন?'

'হোলজম্যানের বিশেষ বন্ধু আফতাব, তাঁর মার্সিডিজ গাড়ির কাঁচ টিনটেড, ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতে দেখে সিকিউরিটি গার্ডরা গাড়িটা সম্ভবত আর ভাল করে চেকও করছিল না, ঠিক এই সুযোগটাই নিয়েছে মেডিলিন। হয়তো প্রটোকল আর সিকিউরিটিকে ফাঁকি দিয়ে ঢাকা শহরটা ঘুরে দেখার শখ হয়েছে।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলালেন রাহাত খান। 'লাঞ্চের সময় বেরিয়েছেন—কে জানে, হয়তো সংসদ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে চটপটি বা ফুচকা খাচ্ছেন এখন।'

এরকম একটা পরিস্থিতিতে রাহাত খান কৌতুক করছেন, ব্যাপারটা রানার কাছে অবিশ্বাস্য লাগল। কিন্তু কৌতুকটা হজম করার সময় পাওয়া গেল না।

নক না করে রাহাত খানের চেম্বারে ঢুকবে, এত সাহস কারও নেই; অথচ সেটাই ঘটতে যাচ্ছে। রাহাত খান ভুরু কোঁচকালেন। পরমুহূর্তে হকচকিয়ে না গিয়ে উপায় থাকল না। দীর্ঘদেহী মেজর জেনারেল আফতাব দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালেন, তাঁকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে সোজা এগিয়ে এলেন ভারী শরীর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডিলিন কোরবেল অলব্রাইট।

চোখে চকলেট রঙা চশমা, ডেস্কের দিকে এগোবার সময় সেটা মাথার ওপর তুলে চাঁদিতে আটকালেন ভদ্রমহিলা। মিডিয়ার বদৌলতে অতিপরিচিত মৃদু হাসিটি ঠোঁটে লেগে আছে, রাহাত খানকে দেখে এবার তাঁর চোখ দুটোও হেসে উঠল। চেম্বারের সাদা আলোয় সোনালি চুল ঝলমল করছে। গলায় তিন প্রস্থ প্ল্যাটিনাম নেকলেস। লাল কোটের সামনের দিকে লিচু আকৃতির সাতটা সোনালি বোতাম। কোটের নিচে রূপালি পপলিনের ব্লাউজ আর স্কার্ট। গলায় ওড়নার মত ঝুলছে নীল স্কার্ফ।

শশব্যস্ত হয়ে চেয়ার ছাড়লেন রাহাত খান, ডেস্ক ঘুরে কয়েক পা এগিয়ে এলেন। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করলেন, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে, বাইরে থেকে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিচ্ছেন মেজর জেনারেল আফতাব। চেয়ার ছেড়ে রানাও উঠে দাঁড়াল। 'সারপ্রাইজড?' জিজ্ঞেস করলেন অলব্রাইট।

কি আছে অলব্রাইটের হাসিতে? চেম্বার ছেড়ে পালিয়ে যাবার তাগাদা অনুভব করছে রানা। প্রৌঢ়ার এই হাসিতে খানিকটা অভিমান আর বিষণ্ণতার আভাস পাচ্ছে ও, যে হাসির অর্থ একমাত্র হয়তো শুধু রাহাত খানের কাছেই ধরা পড়া উচিত। ওঁরা পূর্ব-পরিচিত সন্দেহ নেই; কিন্তু সে পরিচয় কতটুকু গাঢ় ছিল? পালাতে হলেও সুযোগ দরকার, কিন্তু এই মুহূর্তে সে সুযোগ পাচ্ছে কোথায় রানা!

করমর্দনের জন্যে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন রাহাত খান। 'একটা খবর

দিয়ে আসতে পারতে,' বললেন তিনি। 'সিকিউরিটির কথা তুলে মি. ক্লিনটন যেখানে আমাদের জাতীয় স্মৃতিসৌধে গেলেন না...'

রাহাত খানের হাতটা দেখেও না দেখার ভান করলেন অলব্রাইট। তাঁর একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়লেন, তারপর কাঁচা-পাকা গোঁফ লক্ষ করে বাড়িয়ে দিলেন নিজের গাল। ভদ্রমহিলার গালে গাল ঠেকালেন রাহাত খান, প্রথম ডান গালে, তারপর বাম গালে। পিছিয়ে আসবেন, পারলেন না—নরম আলিঙ্গনে তাঁকে বন্দী করলেন অলব্রাইট। বললেন, 'আমেরিকায় গেলেও আজকাল তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো না। কি বললে? সিকিউরিটি? সিআইএ-র এটা বাড়াবাড়ি, রীতিমত অন্যায়। এই যে আমি একা চলে এলাম, সেই অন্যায়ের খানিকটা প্রতিকার করা হলো। এ-সব থাক, রাহাত—কেমন আছ তুমি তাই বলো।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটা চেয়ার দেখালেন রাহাত খান। 'বসো, মেডিলিন।' ভদ্রমহিলা বসার পর নিজের রিভলভিং চেয়ারে ফিরে এলেন তিনি, রানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইলোরার সঙ্গে তুমিও থাকো, রানা, দেখো আপ্যায়নের কি ব্যবস্থা করা যায়।'

'ইয়েস, স্যার,' বলে দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা।

হেড অফিসের ক্যান্টিন আর ফ্রিজ থেকে এটা-সেটা নিয়ে ট্রেটা সাজাতে দশ মিনিটের বেশি লাগল না ওদের। রানার প্রাইভেট সেক্রেটারি পারভিনকে আগেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, মেজর জেনারেল আফতাবকে রানার অফিসে বসিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করছে সে। রাহাত খানের চেম্বারের দরজাটা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল রানা, চাকা লাগানো ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকল পারভিন।

রানা ভেতরে ঢুকছে, শুনতে পেল রাহাত খান বলছেন, '...সবার কথাই বললে, তবে একজনের কথা ভুলে গেছ। পঞ্চান্ন সালে ওয়েলেসলি কলেজে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ত সে...'

অলব্রাইট তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'জানি কার কথা বলছ। কিন্তু তার প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে তোমাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি। ঘালির পর কে, এই প্রশ্নটা যখন উঠল, তিনটে নাম বিবেচনা করি আমরা। তালিকায় তোমার নামটাই সবার ওপরে ছিল, সবুজ কালিতে আন্ডারলাইন করা। কিন্তু প্রস্তাবটা তুমি প্রত্যাখ্যান করলে, কোনও ব্যাখ্যা পর্যন্ত দাওনি। কেন, রাহাত?'

ট্রে থেকে নিয়ে প্লেটগুলো সোফার সামনে নিচু টেবিলে সাজাচ্ছে পারভিন, তাকে রানা সাহায্য করলেও কান রয়েছে ডেস্কের দিকে।

'জানি। বাকি দুটো নাম সাঈদ মুর্তজায়েভ ও কোফি আনান। আমি মুর্তজায়েভের কথাই জানতে চাইছিলাম।'

অলব্রাইট বললেন, 'তুমি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ!'

'মহাসচিব হতে চাইনি, কারণটা অবভিয়াস নয়?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান। 'ভেবে দেখো না, একটা শিশুর ক্ষতি করা সবচেয়ে সহজ নয়?'

'তুমি বাংলাদেশকে মীন করছ।'

'দেশটা কিভাবে স্বাধীন হলো স্মরণ করো,' বললেন রাহাত খান। 'মুখে

বন্ধুত্বের কথা বলে সবাই আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। স্বজাতিকে বিপদের মধ্যে ফেলে সর্বজাতির মঙ্গল করতে যাওয়াটা কি উচিত হত আমার?'

'দুঃখিত, আমারই বুঝতে ভুল হয়েছে,' অলব্রাইট রাহাত খানের যুক্তি মেনে নিলেন। 'আমি খবর রাখি, ইউ আর ডুইং আ ফাইন জব।'

'প্লীজ, ম্যাডাম,' টেবিল সাজানো শেষ হতে মেডিলিন অলব্রাইটকে বলল রানা, 'সোফায় এসে বসুন।'

ওঁরা দাঁড়ালেন, পারভিনের পিছু নিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রানা। পিছন থেকে শুনতে পেল রাহাত খানকে ভদ্রমহিলা বলছেন, 'ছেলেটা মাসুদ রানা না? ওর তো খুব নাম শুনি, আমাদেরও অনেক উপকার করেছে...'

'হ্যাঁ,' রাহাত খানের গলা একটু গম্ভীর। 'কিন্তু তা সত্ত্বেও সিআইএ ওকে সহ্য করতে পারে না।'

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা, আশা করছে মেডিলিন অলব্রাইট সিআইএ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করবেন। কিন্তু না, প্রসঙ্গটা এড়িয়ে তিনি বললেন, 'ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে না?'

ঘুরে এগিয়ে এল রানা। হ্যান্ডশেক করার সময় ভদ্রমহিলা বললেন, 'জিয়ায় তখনও ল্যান্ড করেনি প্লেন, মি. ক্লিনটন আমাকে বলছিলেন—এয়ারপোর্টে নিশ্চয়ই দেখা যাবে তোমাকে।'

'তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ এখান থেকে মনিটর করা হচ্ছে,' বলল রানা। 'বসকে আমি সাহায্য করছি, তাই যেতে পারিনি।'

একে একে সবগুলো মনিটর স্ক্রীনে চোখ বোলালেন অলব্রাইট। সেটা লক্ষ করে রাহাত খান বললেন, 'সিআইএ-র ছড়ানো গুজবটা মিথ্যে, মেডিলিন। তালেবান জঙ্গীরা বাংলাদেশে মি. ক্লিনটনের জন্যে কোন হুমকি নয়।'

এবারও সিআইএ প্রসঙ্গ কৌশলে এড়িয়ে গেলেন অলব্রাইট। হঠাৎ টেবিলে সাজানো খাবারের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন তিনি। 'বাহ্, লিচু! আমগুলোও নিশ্চয়ই রাজশাহীর—ল্যাংড়া?' বাংলাদেশী ফলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করলেন তিনি; স্যান্ডউইচ, পিৎসা, পেস্ট্রি বা জ্যাম-জেলির দিকে ফিরেও তাকালেন না। সোফায় বসে রানাকে বললেন, 'সিট ডাউন, মাই ডিয়ার বয়!'

সবাই খাচ্ছে, তবে রানার কান সজাগ হয়ে আছে কে কি বলেন শোনার জন্যে। পুরানো প্রসঙ্গটা আবার তুললেন রাহাত খান। 'ওয়েলেসলি কলেজে আমাদের দু'জনেরই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল মুর্তজায়েভ। মাথাটা এত ভাল ছিল, প্রফেসররা পর্যন্ত সমীহ করতেন। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি তার কথা সযত্নে এড়িয়ে গেলে। অনেক দিন তার কোন খবর পাই না। ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর ওকে শপথ নিতে দেয়া হয়নি, এটুকু জানি। কিন্তু তারপর মিডিয়া তার কথা একেবারে ভুলে গেছে। মুর্তজা এখন কোথায় বলো তো?'

শুধু ফলই খাচ্ছেন অলব্রাইট, প্রশ্ন শুনে তা-ও বন্ধ হয়ে গেল। 'বেলগ্রেডেই আছে সে, যুগোস্লাভিয়া সরকার তাঁকে হাউসঅ্যারেস্ট করে রেখেছে।'

'মাই গড! কেন?'

'কেন মানে? বলকানে কোন বিচার বা ন্যায়নীতি আছে নাকি? জাতিগত

বিদ্বেষ ওদের মজ্জাগত। মুর্তজা মুসলমান, এরচেয়ে বড় কোনও অপরাধের দরকার আছে?'

'ন্যাটোকে দিয়ে তোমরা তো ওদেরকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করলে,' রাহাত খান বললেন, 'যুগোস্লাভিয়াকে বাধ্য করতে পারলে না মুর্তজাকে মুক্তি দিতে?'

'আমি চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গে বসে পুরানো দিনের কিছু স্মৃতি রোমন্থন করব,' অলব্রাইট বিষণ্ন সুরে বললেন। 'ভাবিনি রাজনীতি নিয়ে কথা তুলে বসবে।'

'আমার অবাক লাগছে,' ধীরে ধীরে বললেন রাহাত খান। 'আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বছরের পর বছর ধরে গৃহবন্দি হয়ে আছে, অথচ আমরা তার জন্যে কিছুই করিনি। ওকে মুক্ত করা তোমার জন্যে তো কোন ব্যাপারই নয়, মেডিলিন!'

দু'সেকেন্ড চুপ করে থেকে প্রশ্নের জবাব দিলেন অলব্রাইট, 'বিরানব্বুই সালে মন্টিনিগ্রো আর সার্বিয়াকে নিয়ে নতুন যে যুগোস্লাভিয়ার জন্ম হয়েছে আমরা সেটাকে স্বীকৃতি দিইনি, রাহাত। ওখানে আমাদের কোন প্রতিনিধি নেই। কাজেই...'

তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে রাহাত খান বললেন, 'তোমরা একমাত্র সুপারপাওয়ার, মেডিলিন।' কয়েক সেকেন্ড তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তারপর আবার বললেন, 'সিআইএ কোথায় কি না করছে...'

রাহাত খানের সেই দৃষ্টি অলব্রাইট যেন সহ্য করতে পারলেন না। মাথা নিচু করে বললেন, 'মুর্তজার জন্যে কিছু করা আমার পক্ষে সত্যি সম্ভব নয়, রাহাত। দুঃখিত।'

'তোমার জবাব আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না,' রাহাত খান নাছোড়বান্দা।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন অলব্রাইট। তারপর বললেন, 'বলকানে আমেরিকানদের নীতি মুর্তজা সমর্থন করে না। যদি বলি, যাদেরকে নিয়ে তার মুক্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব তারা তাকে পছন্দ করে না?' একটু থেমে আবার বললেন, 'তারপরও ধরো তোমার অনুরোধে তাদের সাহায্য নিয়ে মুর্তজাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতে যদি হিতে বিপরীত হয়? বন্ধুকে আরও বড় বিপদে ফেলার ঝুঁকি কি আমার নেয়া উচিত? প্লীজ, আর কোন প্রশ্ন কোরো না।'

এরপর স্মৃতি রোমন্থন। বিদায় পর্বটা অবশ্য খুবই আনন্দঘন হলো। এলিভেটরে ওঠার আগে অলব্রাইট বললেন, 'আমাদের দূতাবাসে কিছু লিচু আর আম পাঠাতে ভুলো না, রাহাত!'

'তুমিও ভুলো না যে কথা দিয়েছ এরপর আমি ওয়াশিংটনে গেলে কিচেনে বসিয়ে ওমলেট খাওয়াবে।'

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, রাহাত খানের পিছু পিছু চেম্বারে ফিরে এল রানা। ও আশা করল, সাঈদ মুর্তজায়েভ সম্পর্কে বস্ ওকে কিছু অন্তত জানাবেন, এমন কি হয়তো তাঁকে সার্বিয়া থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার নির্দেশও দিতে পারেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সেরকম কিছু ঘটল না। এ প্রসঙ্গে

একটা কথাও বললেন না তিনি। তাঁকে অন্যমনস্ক দেখে রানাও কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেল না।

সেদিন রাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে যাবার পর বসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসবে রানা, রাহাত খান ওকে দাঁড়াতে বলে দেরাজ খুলে একটা ফোল্ডার বের করলেন। 'এতে তোমার প্লেনের টিকিট আর ভিসা আছে, কাল সকালের ফ্লাইটে তুমি নিউ ইয়র্কে যাচ্ছ।'

'নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি?' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'কেন, স্যার?'

'জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের জরুরী মীটিং ডাকা হয়েছে,' রাহাত খান বললেন। 'কমান্ডার হিসেবে ওই মীটিঙে তোমাকে থাকতে হবে। কি বিষয়ে আলোচনা হবে ওখানে গেলেই জানতে পারবে···'

'কিন্তু, স্যার···'

ওকে থামিয়ে দিয়ে রাহাত খান বললেন, 'ঠিক আছে, পরে, কেমন? এখন তুমি এসো।'

বসের আচরণে খানিকটা হতভম্ব হয়েই চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। তবে নিউ ইয়র্কে আসার পর দুইয়ে-দুইয়ে চার মেলাতে ওর কোন অসুবিধে হয়নি।

যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী। প্রেসিডেন্ট ভবনে গোপন মীটিং বসেছে।

লাঞ্চ শেষ করে স্টাডিরুমে বিশ্রাম নিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট স্লোবোডান মিলোসেভিচ। আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল, সেখানেই হাজির হলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর ডিরেক্টর। ডিরেক্টর একজন মেজর জেনারেল। তিনি হাতে একটা ফাইল নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। কয়েক মাস ধরে ফিল্ড ওঅর্ক ও গবেষণা চালিয়ে একটা প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে, প্রেসিডেন্টকে দিয়ে আজ সেটা সই করানো হবে। প্ল্যানটা সম্পর্কে বিস্তারিত প্রায় সবই আগে থেকে জানেন তিনি।

কোন কথা হলো না, এমন কি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও মেজর জেনারেল আসন পর্যন্ত গ্রহণ করলেন না। ফাইলটা খুলে কোথায় সই করতে হবে দেখিয়ে দেয়া হলো, প্রেসিডেন্ট খসখস করে সই করে দিলেন। মুখ তুলে তাকাতে বাকি দু'জন প্রশংসা ও তৃপ্তির হাসি হেসে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

মিলোসেভিচ জানতে চাইলেন, 'আমরা তিনজন ছাড়া আর কে ব্যাপারটা জানবে?'

'কার্চিক জোডা। সে তার বাহিনীকে কাজে লাগাবে, তবে এই প্ল্যান সম্পর্কে কিছুই তাদেরকে জানাবে না।'

'প্ল্যানের প্রথম পর্বে আমাদের সেনাবাহিনী, ইন্টেলিজেন্স, পুলিস বা সরকারী কর্মচারীদের যেন কোন ভূমিকা না থাকে,' মনে করিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'অন্তত তদন্ত হলে তাদেরকে যেন দায়ী করা না যায়।'

'যাবে না,' প্রতিরক্ষামন্ত্রী কথা দিলেন।

'ফাইলটা কি আমার কাছে থাকবে?'

'মূল কপিটা ইচ্ছে করলে আপনি রাখতে পারেন, স্যার,' বললেন মেজর জেনারেল। 'তবে একটা কপি আমাদের কাছেও থাকা দরকার।'

ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিলেন প্রেসিডেন্ট। দরজা খুলে তাঁর একজন এইড ঢুকল স্টাডিতে। ইঙ্গিতে ফাইলটা দেখালেন মিলোসেভিচ, বললেন, 'আমাদের ইলেকট্রনিক সেকশনে পাঠিয়ে দাও এটা, বলবে একটা ডুপ্লিকেট কপি দরকার।'

ফাইল নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এইড, প্রেসিডেন্ট পিছন থেকে বললেন, 'আর শোনো, এখানে তিন কাপ কফিও পাঠিয়ে দাও।'

প্রেসিডেন্টের স্টাডি থেকে বেরিয়ে অফিসে ঢুকল এইড, একজন সহকারীকে ফাইলটা ধরিয়ে দিয়ে কি করতে হবে বলল, তারপর ইন্টারকমে কিচেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কফি বানাবার নির্দেশ দিল। সহকারী ফাইল নিয়ে রওনা দিল, কয়েকটা করিডর পার হয়ে চলে এল ইলেকট্রনিক সেকশনে। ভেতরে ঢুকতে হলে পাস লাগে, এইড-এর তা আছে, কিন্তু সহকারীর নেই। দরজায় একজন মিলিটারি পুলিস দাঁড়িয়ে আছে, ফাইলটা তার হাতে না দিয়ে সেকশন চীফকে ডেকে দিতে বলল সহকারী। ওয়াল-ফোনের রিসিভার নামিয়ে যোগাযোগ করল মিলিটারি পুলিস, অপরপ্রান্তের কথা শুনে বলল, 'ঠিক আছে, আপনিই চলে আসুন।' ক্রেডলে রিসিভার রেখে এইড-এর সহকারীকে সে জানাল, 'সেকশন চীফ লাঞ্চের সময় ছুটি নিয়ে চলে গেছে, সন্ধের আগে ফিরবে না। একজন টেকনিশিয়ান আসছে।'

টেকনিশিয়ান আসলে ফটোস্ট্যাট মেশিনের অপারেটর। সে মন্টিনিগ্রোর খ্রিস্টান, তবে বিয়ে করেছে একজন মুসলমান মেয়েকে। সে আসতে এইড-এর সহকারী তার হাতে ফাইলটা ধরিয়ে দিয়ে কপি করে আনতে বলল।

মেশিন অপারেটর ইলেকট্রনিক রূমে ফিরে এসে কাজ শুরু করল। ফটোস্ট্যাট মেশিন থেকে বেরিয়ে আসা প্রিন্টআউটে কালি কম-বেশি হয়ে যাচ্ছে কিনা দেখার জন্যে কপি করা প্রথম পাতাটার ওপর চোখ বোলাচ্ছে। হঠাৎ একটা শব্দ দেখে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল, হার্টবিটও বেড়ে গেল—কার্চিক জোডা! নামটা এতই ভীতিকর, কয়েক সেকেন্ড নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল সে। তারপর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পাতা দ্রুত পড়ে ফেলল। পড়ার পর মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল তার। কী সর্বনাশ! এ তো ভয়ঙ্কর একটা ষড়যন্ত্র!

মেশিন অপারেটর উপলব্ধি করল, ফাইলটা পড়াই তার পাপ হয়ে গেছে। সে এতই ক্ষুদ্র, এতই অসহায়, এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। অথচ, কিছু করতে না পারায় সারাজীবন তাকে জর্জরিত করবে অপরাধবোধ।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। কাঁপা হাতে বাকি পাতাগুলো কপি করতে শুরু করল সে। পুরো ফাইলটা কপি করার পর তার মনে হলো, এতক্ষণ সে একটা ঘোরের মধ্যে ছিল; তা না হলে কোন বুদ্ধিতে বা কি উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাতার দুটো করে কপি করল?

কপি করা সাতটা পাতা একটা বড় এনভেলাপে ভরল অপারেটর। বাকি সাতটা পাতা ভাঁজ করে ঢুকাল বেল্টের নিচে, যদিও জানে না এগুলো নিয়ে কি

করবে।

ছুটির পর বাড়ি ফেরার সময় এক চাচাতো ভাইয়ের কথা মনে পড়ল তার। ভাইটির স্টুডিও আছে, অনুরোধ করলে ফটোস্ট্যাট করা ফাইলটার মাইক্রোফিল্ম তৈরি করে দেবে সে। বড় কাগজের চেয়ে মাইক্রোফিল্ম লুকিয়ে রাখা অনেক সহজ। লুকিয়ে রেখে কি লাভ, এই প্রশ্নও জাগল তার মনে, তবে আপাতত ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করল না।

বাড়ি ফিরে অপারেটর দেখল তার স্ত্রীর এক আত্মীয়া বেড়াতে এসেছেন। ইনি গৃহবন্দী সাঈদ মুর্তজায়েভের দ্বিতীয় স্ত্রী। চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়। স্ত্রীকে চায়ের জন্য পাঠিয়ে মিসেস মুর্তজায়েভকে সব কথা খুলে বলল সে। মাইক্রোফিল্মে কি আছে শুনে আঁতকে উঠলেন ভদ্রমহিলা। অপারেটরকে তিনি বললেন, 'ওটা আমাকে দাও। কাল জাতিসংঘের একজন প্রতিনিধি মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা করতে আসছে, সে ওটা তাঁর হাতে তুলে দেবে।' ভদ্রমহিলা মাইক্রোফিল্ম নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, চা পর্যন্ত খেলেন না।

রাত ঠিক আটটায় অপারেটরের বাড়িতে হানা দিল সিক্রেট পুলিস।

সন্ধে ঠিক সাতটায় ইলেকট্রনিক সেকশনের চীফ ফিরে আসে প্রেসিডেন্ট ভবনে নাইট ডিউটির জন্যে। ফিরেই খবর পায় প্রেসিডেন্ট টপ সিক্রেট একটা ফাইল কপি করতে পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টারের মাম্বার চেক করল সেকশন-চীফ। নিজের নোটবইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখল সাতটা নয়, কপি করা হয়েছে মোট চোদ্দ পৃষ্ঠা। সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করল সে।

মেশিন অপারেটরের বাড়ি সার্চ করে কিছুই পাওয়া গেল না। স্ত্রী সহ তাকে ধরে আনা হলো সিক্রেট পুলিসের হেডকোয়ার্টারে। ইতিমধ্যে তারা খবর পেয়েছে সন্ধের খানিক আগে অপারেটরের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন মিসেস মুর্তজায়েভ। ফলে সেই রাতে তাঁদের বাড়িতেও তল্লাশী চালানো হলো, কিন্তু কোন লাভ হলো না।

অমানবিক টরচার করায় ভোররাতে মারা গেল মেশিন অপারেটর। তার স্ত্রীকে পুলিস হেডকোয়ার্টারে আটকে রেখে চলল অকথ্য নির্যাতন।

কি ঘটে গেছে শোনার পর বেলগ্রেডের পুলিস চীফ ড. দেবারভিল সিডাক সাঈদ মুর্তজায়েভের বাড়ির ওপর নজর রাখার জন্যে প্রহরী পুলিসের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকায় জাতিসংঘের একজন প্রতিনিধি মুর্তজায়েভের সঙ্গে পরদিন দেখা করতে এলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সতর্ক দু'জন পুলিস অফিসার থাকল। মাইক্রোফিল্মটা সাঈদ মুর্তজায়েভ লুকিয়ে রেখেছিলেন, অফিসারদের সামনে সেটা তিনি পাচার করতে পারলেন না। তবে কথা প্রসঙ্গে ভদ্রলোককে বললেন, 'আমি একটা পাণ্ডুলিপি প্রায় শেষ করে এনেছি, বিশেষ কারণে খুব তাড়াতাড়ি সেটা প্রকাশ করা দরকার—ভাল কোন প্রকাশক পাওয়া যায় কিনা একটু খোঁজ করে দেখবেন, প্লীজ?'

ঘটনাচক্রে জাতিসংঘের ওই প্রতিনিধি একজন বাংলাদেশী মেজর, ইউএন

পীসকীপিং মিশনের সদস্য হিসেবে কসোভোয় দায়িত্ব পালন করতে এসেছেন। তিনি বাঙালী, এটা জানতে পেরে সাঈদ মুর্তজায়েভ মনে মনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। পুলিস অফিসারদের সামনেই ভাঙা ভাঙা বাংলায় মেজরকে কয়েকটা কথা বললেন তিনি, 'আমার কাছে ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্রের গোপন দলিল আছে। আমি বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বাস করি না, শুধু বাংলাদেশ থেকে জেনারেল রাহাত খান যদি কাউকে পাঠান, তাঁর হাতে ওটা আমি তুলে দেব।'

বাংলাদেশী মেজর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ পাননি, সময় শেষ হয়ে গেছে বলে তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় পুলিস অফিসাররা।

কসোভোয় ফিরে গিয়ে জাতিসংঘের সদর দফতর নিউ ইয়র্ক আর বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায় রিপোর্ট করলেন মেজর।

সাঈদ মুর্তজায়েভের মেসেজ পাবার পর মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

তারপর সব কিছু খুব দ্রুত ঘটতে থাকে। রাহাত খানের প্রস্তাব মেনে নিয়ে জাতিসংঘ থেকে জানানো হয়, লন্ডনের একজন পাবলিশার হিসেবে রানার কাভার তৈরি করা সম্ভব। ফ্রাঙ্কফুর্টে একটা বইমেলা চলছে, সেই মেলা হয়ে বেলগ্রেডে ঢুকবে রানা। যুগোস্লাভিয়া থেকে গোপন দলিল বের করে আনার জন্যে প্রয়োজনে ব্রিটিশ দূতাবাসেরও সাহায্য পাবে ও, অর্থাৎ ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে। ব্রিটিশ দূতাবাসে ম্যাক বিলিয়ার্ড নামে একজন অফিসার আছেন, এক সময় জাতিসংঘে কাজ করতেন, বেলগ্রেডে পৌঁছে রানাকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে বেলগ্রেডে ঢুকতে রানার কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু হোটেলে ওঠার পর প্রথম রাতেই ওর স্যুইটে খুন হয়ে গেল আলভিক নুরানিক নামে এক কিশোর।

তিন

বেলগ্রেডের ব্রিটিশ দূতাবাস-প্রধান রানার ব্যক্তিগত বন্ধু, তাই পরদিন সকালে প্রথমে তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে চাইল ও। ওকে জানানো হলো, তিনি লন্ডনে গেছেন, ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে। রানা তখন ইকনমিক কাউন্সেলর ম্যাক বিলিয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

রিসেপশনে অপেক্ষা করছে রানা। 'হ্যালো, মি. রানা,' বলে তীক্ষ্ণ চেহারার এক লোক ঢুকল ভেতরে, বয়স হবে ত্রিশ-বত্রিশ। সোফা ছেড়ে তার বাড়ানো হাতটা ধরল রানা। 'আমি জেমস ফোলি, সেকেন্ড সেক্রেটারি, কালচারাল অ্যাফেয়ারসের চার্জে আছি। মি. বিলিয়ার্ড এই মুহূর্তে একটু ব্যস্ত। আপনি আমার অফিসে বসবেন আসুন, প্লীজ।'

রানা ইতস্তত করছে।

'আপনি যে এখানে আসছেন সে খবর আমরা আগেই পেয়েছি, মি. রানা,' বলল ফোলি। তার দৃষ্টি এতই প্রখর, যেন রানার ভেতর সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। 'কাল রাতে কি ঘটেছে তা-ও আমরা জানি।'

'কিভাবে?' রানা নড়ছে না।

'আমাদের কাজই তো কোথায় কি ঘটছে খবর রাখা,' বলল ফোলি। 'আসুন, নিরিবিলিতে বসে আলাপ করি। আপনি যে খুব সিরিয়াস একটা বিপদে পড়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

রানা কিছু বলার আগেই রিসেপশনিস্ট বলল, 'মি. বিলিয়ার্ড আপনাদের জন্যে তাঁর অফিসে অপেক্ষা করছেন, মি. ফোলি।'

'আসুন, ওঁর অফিসেই বসি তাহলে,' বলে হাঁটা ধরল ফোলি, অগত্যা বাধ্য হয়েই তার পিছু নিতে হলো রানাকে।

ম্যাক বিলিয়ার্ড শান্ত প্রকৃতির দীর্ঘদেহী মানুষ, বয়স পঁয়ষট্টির কাছাকাছি, চেহারায় মার্জিত ভাবটুকু স্পষ্ট। রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার পর বসতে অনুরোধ করলেন, তারপর বললেন, 'কাল রাতে ঠিক কি ঘটেছে বলুন তো আমাকে।'

সাঈদ মুর্তজায়েভের চিরকুটের কথাটা বাদ রেখে সব কথাই বলল রানা।

ও থামতে বিলিয়ার্ড জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ঠিক জানেন, ছেলেটার নাম আলভিক নুরানিক?'

রানা মাথা ঝাঁকাল। 'ড. সিডাক তো তাই বললেন।'

ফোলি বলল, 'পুলিস নিশ্চয়ই আপনার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল চার্জ আনবে। পাসপোর্টে আপনাকে যেহেতু ব্রিটিশ নাগরিক বলা হয়েছে, আপনার পক্ষ নিয়ে আমাদেরকেও লড়তে হবে। কিন্তু কতটুকু কি করতে পারব বলা মুশকিল। ওরা যদি চায় আপনাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাবে···' কথা শেষ না করে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'তুমি এতটা ঘাবড়ে না গেলেও পারো,' ফোলিকে নরম সুরে তিরস্কার করলেন বিলিয়ার্ড। 'কোন প্রমাণ ছাড়া মি. রানার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ ওরা আনবে না। খুনটা যেহেতু মি. রানা করেননি, তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ থাকারও প্রশ্ন ওঠে না।'

'আপনি কি জানেন না, পছন্দ না হলে নিরীহ লোককেও ফাঁসিয়ে দেয় ওরা?' বিলিয়ার্ডকে পাল্টা প্রশ্ন করল ফোলি। 'যুগোস্লাভিয়ায় আইন বা বিচার বলে কিছু আছে?'

'ওরা বাড়াবাড়ি করলে আমরাও আঙুল বাঁকা করতে জানি,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'তারপরও পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠলে মি. রানাকে আমরা নিরাপদে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দেব।'

'ভুলে গেলেন, গত মাসে গোপনে যুগোস্লাভিয়া ত্যাগ করতে গিয়ে সতেরোজন মারা পড়েছে,' মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল ফোলি। 'সীমান্তরক্ষীরা বলছে তাদেরকে থামতে বলা হয়েছিল, না থামায় গুলি করতে বাধ্য হয়েছে।

তারপরও আপনি কি করে আশা করেন মি. রানাকে সীমান্তের ওপারে পাচার করতে পারব আমরা?'

এরপর আর রানার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না। 'আপনারা অযথা তর্ক করছেন। আমি কি বলেছি ওদেরকে বলুন আমাকে যেন ইলেকট্রিক চেয়ারে না বসায়? কিংবা বলেছি, আমাকে কাঁধে তুলে সীমান্তের ওপারে রেখে আসুন?'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। ফোলি থতমত খেয়ে গেছে। সে-ই অবশ্য নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'তাহলে আপনি আমাদের কাছে কি জন্যে এসেছেন?'

'আমি এসেছি মি. বিলিয়ার্ডের সঙ্গে পরিচিত হতে,' বলল রানা। 'আমি একজন প্রকাশক। আমাকে বলা হয়েছে, এখানকার কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে উনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

'হ্যাঁ,' সমর্থন করার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন বিলিয়ার্ড। 'নিউ ইয়র্কের আমার বন্ধু মহল এ-ব্যাপারে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে আমাকে। তো, মি. রানা, বলুন দেখি মি. সাঈদ মুর্তজায়েভ সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

রানা সতর্ক হয়ে গেছে, জেমস ফোলির সামনে বিলিয়ার্ডের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে রাজি নয়। 'লেখক-সাহিত্যিকদের একটা তালিকা আছে আমার কাছে, তাতে সাঈদ মুর্তজায়েভের নামও আছে। ভদ্রলোক সম্পর্কে তেমন কিছুই আমি জানি না।'

'পুলিস চীফ ড. সিডাক তাঁর সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেননি?'

'হ্যাঁ, বলেছেন। ভদ্রলোক ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে শপথ নিতে দেয়া হয়নি। বেশ কয়েক বছর ধরে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে তাঁকে।' একটু থেমে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ভদ্রলোক সম্পর্কে আপনারা কতটুকু কি জানেন বলবেন আমাকে?'

'তাঁর সম্পর্কে ধারণা দেয়া সহজ কাজ নয়,' ধীরে ধীরে বললেন বিলিয়ার্ড। 'যুগোস্লাভ বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে পর্বতের সঙ্গে তুলনা করেন। কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক হিসেবে বোদ্ধাদের নমস্য তিনি। কিন্তু শাসকশ্রেণীর চক্ষুশূল। তাঁর রাজনীতি...'

'তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে বেশি কিছু না বলাই ভাল,' বিলিয়ার্ডের কথা কেড়ে নিয়ে বলল ফোলি। 'সত্যি কথা বলতে কি, রাজনীতিক হিসেবে ভদ্রলোক পুরোপুরি ব্যর্থ।'

'সাঈদ মুর্তজায়েভের রাজনৈতিক দর্শনে কোনও ত্রুটি নেই,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'রাজনীতিক হিসেবে তাঁর ব্যর্থতার জন্যে দায়ী সরকার ও আন্তর্জাতিক মাতব্বররা। তিনি বিশ বছর ধরে বলে আসছেন, বলকানের প্রতিটি জাতিগোষ্ঠিকে স্বাধীন হতে না দিলে গত সাতশো বছর ধরে যে আগুন জ্বলছে তা কোনদিন নিভবে না। তাঁর এই বক্তব্য তিক্ত হলেও, বাস্তব সত্য।'

'ভদ্রলোক কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লিখিয়েছিলেন, এটা তাঁর এক মারাত্মক ভুল ছিল না?' বিলিয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করল ফোলি।

'তৎকালীন যুগোস্লাভিয়ায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির চর্চা করত একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই। তিনিও ধর্ম-নিরপেক্ষতার সমর্থক ছিলেন। পরে পার্টির মূল

স্রোত তাদের নীতি বদলায়, তিনিও পার্টি ভেঙে বেরিয়ে আসেন। এর মধ্যে তাঁর ভুলটা কোথায় ছিল?'

'পার্টিতে নাম লিখিয়েছিলেন বলেই তো পার্টি তাঁর সঙ্গে বেঈমানী করার সুযোগ পেল,' মন্তব্য করল ফোলি। তারপর বলল, 'ন্যাটো বোমাবর্ষণ করার পর আরও একটা ভুল করলেন তিনি। কসোভোয় রাজনৈতিক স্থিতি সমর্থন করার শর্তে যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে মুক্ত করে আনার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন, 'আমেরিকানরা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির ক্ষতি করছে, আমি সে-কাজে তাদেরকে সমর্থন করতে পারি না। তিনি কসোভো সহ সার্বিয়ার বড় একটা অংশ বসনিয়ার অন্তর্ভুক্ত দেখতে চান। এখন আবার শোনা যাচ্ছে, রাজনীতির ওপর একটা বই লিখেছেন। কোনও সন্দেহ নেই, বইটা আমেরিকা ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধেই লেখা হয়েছে।'

'বই যদি সত্যি তিনি একটা লিখে থাকেন,' বলল রানা। 'আমি ওটা অনুবাদ করে ছাপতে চাই।'

মুচকি হেসে ফোলি বলল, 'কিন্তু আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন কিভাবে? সিক্রেট পুলিস আপনাকে অনুমতি দেবে বলে মনে হয় না।'

'এ-ব্যাপারে আপনি আমাকে কোনরকম সাহায্য করতে পারেন?' বিলিয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা।

কথা না বলে ডেস্ক থেকে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন বিলিয়ার্ড। সার্ব-ক্রোট ভাষায় কয়েকটা কথা বলে চেয়ার ছাড়লেন, রানাকে বললেন, 'চলুন, ড. সিডাকের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

'কিন্তু উনি আমাকে বেলা আড়াইটায় যেতে বলেছেন।'

বিলিয়ার্ডের গম্ভীর চেহারায় ক্ষীণ হাসি ফুটল। 'ড. সিডাক এখুনি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।'

'কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল ফোলি।

'মার্ডার কেসটা সম্পর্কে খোঁজ নেয়া দরকার না?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন বিলিয়ার্ড। 'তাছাড়া, মি. রানা যাতে সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা করতে পারেন তার ব্যবস্থাও তো করতে হবে।'

'আপনার বদলে আমি গেলে ভাল হয় না?' সুর আরও নরম করল ফোলি।

'না, জেমস, ধন্যবাদ। ড. সিডাকের সঙ্গে তোমার চেয়ে আমারই খাতির বেশি।'

সাদা একটা ক্যাডিলাকে চড়ে রওনা হলো ওরা। ঘড়ির কাঁটায় সকাল দশটা, কিন্তু ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে সূর্য। ডিপ্লোম্যাটিক জোনটা বিশাল। শিশির ভেজা রাস্তা, ফুটপাথ আর পাতাবিহীন সারি সারি গাছ চকচক করছে। বিদেশী দূতাবাস ও সরকারী দফতর, প্রতিটি ভবনের গায়ে চকচকে তামার নামফলক দেখা যাচ্ছে, পাশেই লাল কিংবা সবুজ রঙ করা কাঠের সেন্ট্রি-বক্স, ভেতরে সশস্ত্র গার্ডরা সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে চারদিকে। পিস্তল, রাইফেল, সাবমেশিন গান—সব রকম অস্ত্রই দেখতে পেল রানা। এমন কি গার্ডদের বেল্টে গ্রেনেডও আছে। এলাকাটা পার

হবার আগে আরও একটা জিনিস লক্ষ করল ও—দূতাবাস বা সরকারী দফতর, কোথাও কেউ সরাসরি গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকছে না বা বেরুচ্ছে না। চারদিকে মার্সিডিজ বেঞ্জ-এর ছড়াছড়ি, দু'চারটে রোলসরয়েসও আছে, সবই রাস্তার ধারে পার্ক করা।

মার্শাল টিটো অ্যাভিনিউয়ে ঢুকল ক্যাডিলাক। সিক্রেট পুলিসের হেডকোয়ার্টার চৌরাস্তার কাছাকাছি। বিশাল ইমারত, এক সময় সম্ভবত কোন রাজার প্রাসাদ ছিল। লোহার প্রকাণ্ড গেট, কিন্তু সেটা বন্ধ। গেটের পাশে ছোট একটা দরজা, ওটা দিয়েই লোকজন আসা-যাওয়া করছে। প্রাসাদের সামনে ও দু'পাশে বেশ কিছু গাড়ি রয়েছে, তবে রাস্তায় জনমনুষ্যি নেই, একদম ফাঁকা। রাস্তার উল্টোদিকে গাড়ি থামালেন বিলিয়ার্ড।

'গুরুত্বপূর্ণ কোন বিল্ডিঙেই আজকাল গাড়ি নিয়ে ঢোকা যায় না, সরকারী নিষেধ,' গাড়ি থেকে নেমে রানাকে বললেন তিনি। 'তার কারণও আছে। কয়েকটা পুলিস স্টেশন আর সরকারী ভবন আত্মঘাতী বোমায় উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

রবিবার, সরকারী ছুটির দিন, তবু কাজ হচ্ছে আশপাশের অফিসে। ভাল করে দু'দিক দেখে নিয়ে রাস্তা পেরুচ্ছে ওরা। পুলিস হেডকোয়ার্টারের মূল গেট বন্ধ থাকলেও ভেতরের পাকা উঠান আর উঠানের দুই প্রান্তে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো দু'সারি লোককে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। ফাঁকা উঠানে একজন সেন্ট্রিকে দেখা যাচ্ছে, ইউনিফর্ম পরা, হাতে সাবমেশিন গান। সেন্ট্রির পাশে কালো ওভারকোট পরা এক লোক, রানার মনে হলো সে যেন সরাসরি ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। গেটের পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে এই মুহূর্তে কেউ ঢুকছে না, তবে হাতকড়া পরানো কয়েকজন বন্দীকে দেখা গেল, একদল পুলিস তাদেরকে লাইন দিয়ে বের করে আনছে। বন্দীদের মধ্যে জিনসের নোংরা প্যান্ট-শার্ট পরা এক তরুণীও রয়েছে।

বিলিয়ার্ড কথা বলছিলেন, তাই আওয়াজটা শুনতে পাননি। বাঁক নিয়ে মার্শাল টিটো অ্যাভিনিউয়ে ঢুকছে একটা দ্রুতগামী গাড়ি, কংক্রিটের সঙ্গে চাকা ঘষা খাওয়ায় কর্কশ শব্দ উঠল। ওরা তখন মাঝরাস্তায়। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। পরমুহূর্তে চিৎকার করে বলল, 'বিপদ! ফিরে আসুন এপারে!'

রানার দেখাদেখি বিলিয়ার্ডও ঘাড় ফিরিয়েছেন। রানা ছুটতে শুরু করলেও, বজ্রাহতের মত রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। প্রকাণ্ড এক দৈত্যের মত কালো মার্সিডিজটা আর মাত্র বিশ গজ দূরে, তীরবেগে ছুটে আসছে। ঘন কুয়াশার ভেতর হেডলাইট জ্বেলে রেখেছে ড্রাইভার। ড্রাইভারের মাথায় হ্যাট, চোখে গগলস, চেহারা দেখা যাচ্ছে না। প্যাসেঞ্জার সীটে বসা লোকটা নিজেকে লুকাবার চেষ্টায় নিচু করে রেখেছে মাথা। বিলিয়ার্ড অবশ হয়ে গেছেন, অবিশ্বাস ও আতঙ্কে চোখজোড়া বিস্ফারিত। চোখের কোণ দিয়ে দেখলেন, অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে আসছে রানা, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে ডাইভ দিল তাঁকে লক্ষ্য করে। পরমুহূর্তে দু'জনেই ছিটকে পড়ল রাস্তার ওপারে।

গা রি-রি করা আওয়াজ তুলে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল মার্সিডিজ। সেদিকে

ঘাড় ফেরাবার আগে পুলিস হেডকোয়ার্টারের ছোট দরজার ওপর চোখ আটকে গেল রানার। বন্দীদের নিয়ে হেডকোয়ার্টারের ভেতরে হুড়মুড় করে ঢুকে যাচ্ছে পুলিস। রানার তাকিয়ে থাকার কারণ হলো, পুলিসরা তরুণী বন্দিনীকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে বারবার, ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না, অথচ ফিরতি লাইনে সে-ই সবার আগে ছিল।

মার্সিডিজের দিকে ঘাড় ফেরাতে ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা স্টেনগানের ব্যারেল। এক মুহূর্ত পর বিলিয়ার্ডও দেখতে পেলেন সেটা। কোটের পকেটে হাত ভরছেন, সেই সঙ্গে একটা গড়ান দিয়ে রানার শরীরে উঠে পড়লেন, কাভার দিচ্ছেন। তারপর গুলি করার জন্যে হাতটা লম্বা করলেন।

স্টেনগান ঝাঁকি খেতে শুরু করল, সেই সঙ্গে নাচতে লাগল হেডকোয়ার্টারের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা নিঃসঙ্গ তরুণী। গুলির ঝাঁকটা রানা ও বিলিয়ার্ডের মাথার ওপর দিয়ে ছুটছে, একটাও ওদের কাছাকাছি কোথাও লাগল না।

ঝাঁঝরা শরীর নিয়ে বন্ধ দরজার পাশে পড়ে গেল হ্যান্ডকাফ পরা বন্দিনী। মার্সিডিজ আবার ছুটল। লাফ দিয়ে সিধে হয়ে পর পর কয়েকটা গুলি করলেন বিলিয়ার্ড, কিন্তু বৃথাই; বাঁক ঘুরে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা।

বিলিয়ার্ড সিধে হতেই লাফ দিয়ে ছুটল রানা, তরুণীর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। পালস পাবে না জানে, কারণ দেখতে পাচ্ছে, শুধু যে বুকটা চুরমার হয়ে গেছে তা নয়, কপালেও একটা বুলেট লেগেছে। যে মারা গেছে তাকে আর কি সাহায্য করবে ও, তরুণীর বিস্ফারিত চোখ দুটো শুধু বন্ধ করে দিল। সিধে হয়ে দাঁড়াবার পর ব্যাপারটা খেয়াল করল—প্রকাশ্য দিবালোকে, পুলিস হেডকোয়ার্টারের গেটে একজন বন্দিনী খুন হলো অথচ আশপাশ থেকে কেউ এগিয়ে আসছে না। চারদিকে চোখ বুলিয়ে আরও বিস্মিত হলো রানা। রাস্তার এপাশে সারি সারি অনেক বিল্ডিং, ভেতরে ও বাইরে মানুষের ভিড়; রাস্তার ওপারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাইভেট কার, প্রচুর লোকজন আসা-যাওয়া করছে, দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু ভুলেও কেউ এদিকে তাকাচ্ছে না।

লোহার গেট দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল রানা। হেডকোয়ার্টারের উঠানে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, একজন ইউনিফর্ম পরা সেন্ট্রি, অপরজন কালো কোট পরা সিভিলিয়ান; তাদের একজনকেও এখন দেখা যাচ্ছে না। উঠানের দুই প্রান্তে দু'সারি লোককে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল, তারা এখনও আছে, কিন্তু সবাই নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে, গেটের দিকে পিছন ফিরে। গেটের গ্রিলে নাক ঠেকিয়ে ভেতরের সেন্ট্রি-বক্সটা দেখার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু সেটার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন পুলিস আর বন্দীদের দেখতে পেল ও, সেন্ট্রি-বক্সের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে।

ছোট দরজার গায়ে ঘুসি মারছেন বিলিয়ার্ড। সার্ব-ক্রোট ভাষায় ডাকাডাকি করছেন। প্রায় এক মিনিট পর সেন্ট্রি-বক্সের দরজা খুলে গেল। হাতের স্টেনগান আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বাগিয়ে ধরে গেটের দিকে এগিয়ে এল একজন সেন্ট্রি, রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই?'

রানার পাশে চলে এলেন বিলিয়ার্ড। 'আমি ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে আসছি, ইকনমিক কাউন্সেলর।' পকেট থেকে আইডি বের করে দেখালেন সেন্ট্রিকে। 'পুলিস চীফের সঙ্গে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলে সেন্ট্রি-বক্সে ফিরে গেল লোকটা। উঁকি দিয়ে তাকে টেলিফোনে কথা বলতে দেখল রানা। একটু পর বেরিয়ে এসে গেটের পাশের দরজা খুলে দিল। বিলিয়ার্ড ও রানা ভেতরে ঢুকল। সেন্ট্রি আবার দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, রানা জিজ্ঞেস করল, 'লাশটার কি হবে?'

লোকটা তাকিয়ে থাকল, কথা বলছে না। সে ইংরেজি জানে না, বুঝতে পেরে ওই একই প্রশ্ন সার্ব-ক্রোট ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন বিলিয়ার্ড। লোকটার জবাব ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনালেন রানাকে, 'অ্যামবুলেন্সকে খবর দেয়া হয়েছে, লাশটা মর্গে নিয়ে যাওয়া হবে।'

লোকটাকে আবার প্রশ্ন করল রানা, 'আত্মরক্ষার জন্যে বন্দী আর পুলিস ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। মেয়েটি ছিল সবার আগে। কিন্তু তাকে তুমি বার বার সরিয়ে দিচ্ছিলে, সে যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে। কেন?'

প্রশ্নটা ভাষান্তর করছেন বিলিয়ার্ড। লোকটা শুনছে ঠিকই, কিন্তু তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

বিলিয়ার্ডের মুখে তার জবাবটা শুনল রানা। 'মেয়েলোকটার গা থেকে উৎকট দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল, তাই তাকে দূরে সরে থাকতে বলা হচ্ছিল। পুলিস প্রহরীরা চাইছিল, সবার শেষে ভেতরে ঢুকবে সে।'

জবাব শুনে রানা সন্তুষ্ট হতে পারল না। রাগ চেপে রেখে মেয়েটার পরিচয় জানতে চাইল ও।

সেন্ট্রি মাথা নাড়াল, অর্থাৎ তরুণীর পরিচয় সে জানে না। এই সময় বন্দীদের নিয়ে সেন্ট্রি-বক্সের পিছন থেকে বেরিয়ে এল পুলিসের ছোট্ট দলটা। প্রশ্ন শুনে তারাও মাথা নাড়ল। রানা বুঝতে পারল, পরিচয় জানলেও বলবে না ওরা।

রানার হাত ধরে টান দিলেন বিলিয়ার্ড। 'এদের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই। আসুন, লাইনে দাঁড়াই।'

'কি ঘটল বলতে পারবেন? আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে?' লাইনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমরা হেডকোয়ার্টারে আসছি, তা শুধু পুলিস চীফ আর মি. ফোলি জানেন, তাই না?'

'মি. ফোলি আমাদের লোক,' বিলিয়ার্ডের বলার সুরে কেমন যেন একটা ইতস্তত ভাব। 'সে বরং চাইবে সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে আপনার দেখা হোক। আমরা আসছি, এ-খবর ড. সিডাকের অফিস থেকেই ফাঁস হয়েছে, সে তাঁর জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারে।'

'আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন, বেলগ্রেড পুলিস চীফের ফোন ট্যাপ করা হয়?'

'সিক্রেট পুলিস বিভাগে দুটো সেকশন আছে,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'একটা ল অ্যান্ড অর্ডার সেকশন, আরেকটা পলিটিক্যাল ক্রাইম সেকশন। দ্বিতীয় সেকশনটা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। এমন কি মন্ত্রী-মিনিস্টারদের ফোনও ট্যাপ করে

তারা। প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচ ছাড়া আর কারও কাছে তারা জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।'

'তাহলে কি পুলিসের পলিটিক্যাল ক্রাইম সেকশন থেকে পাঠানো হয়েছিল গাড়িটা আপনাকে চাপা দেয়ার জন্যে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'গুলিও করেছে আপনাকে লক্ষ্য করেই?'

মাথা নাড়লেন বিলিয়ার্ড। 'গাড়ি চাপা? না। শুধু ভয় দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল ওদের।' একটা সিগারেট ধরালেন। 'নিউ ইয়র্ক থেকে আমার বন্ধুমহল অনুরোধ করেছে, আমি যেন সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিই। ওদের ধারণা, চেষ্টা করলে আমি পারব। আমার নিজেরও সে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বোধহয় সম্ভব নয়। মিলোসেভিচ সরকার চায় না আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন।'

'ভয় দেখানোর জন্যে একজন বন্দিনীকে মেরে ফেলবে?'

'ওটা সম্ভবত অ্যাক্সিডেন্টালি…'

'না,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'গোটা ব্যাপারটা প্ল্যান করে ঘটানো হয়েছে। প্ল্যানটা যে-ই করে থাকুক, বলতেই হবে, তার টাইমিংটা নিখুঁত। আমার ধারণা, আমি যে উদ্দেশ্যে বেলগ্রেডে এসেছি তার সঙ্গে ওই মেয়েটার কোন না কোন সম্পর্ক ছিল। ওর পরিচয় জানতে পারলে…'

'তবে ওরা যে আপনাকে সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা করতে দিতে চায় না, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'কাল রাতে আপনার হোটেল রূমে যে ছেলেটা খুন হলো, আলভিক নুরানিক, সে কে জানেন?'

'কে?'

'মি. মুর্তজায়েভের ভাগ্নে, তাঁর আপন বোনের ছেলে। সে নিশ্চয়ই আপনাকে কোন মেসেজ দিতে এসেছিল।'

'ওহ্, গড!'

আওয়াজ শুনে গেটের দিকে তাকালেন বিলিয়ার্ড, দেখাদেখি রানাও। গেটের বাইরে একটা অ্যামবুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছে। হসপিটাল কর্মীরা তরুণীর লাশ তুলছে স্ট্রেচারে। একটু পর অ্যামবুলেন্সের পিছনে থামল একটা প্রিজন ভ্যান।

'মেসেজ একটা সত্যিই পেয়েছি আমি,' বিড় বিড় করল রানা।

'হোয়াট!'

খুন হবার আগে নুরানিক ওকে কি বলেছে, খুন হবার পর স্লিপারের ভেতর চেম্বারমেইডের রাখা চিরকুটটা কিভাবে পেল, তাতে কি লেখা ছিল, সংক্ষেপে সবই বলল রানা।

শুনে বিলিয়ার্ড বললেন, 'কথাটা দূতাবাসেই আমাদেরকে বলা উচিত ছিল, মি. রানা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'দুঃখিত, আমাকে শুধু আপনাকেই বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, আর কাউকে নয়।'

লাইনটা খুব ধীরে এগোচ্ছে।

'সেক্ষেত্রে,' গলা খাদে নামিয়ে বিলিয়ার্ড বললেন, 'খুলে বলুন তো কি

উদ্দেশ্য নিয়ে বেলগ্রেডে এসেছেন আপনি।'

'সাঈদ মুর্তজা জাতিসংঘে খবর পাঠিয়েছেন, টপ সিক্রেট একটা ডকুমেন্ট আছে তাঁর কাছে, সেটা বিশ্বস্ত কারও মাধ্যমে পাচার করতে চান।'

'টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট? পাণ্ডুলিপি নয়?'

'হয়তো পাণ্ডুলিপিও?'

'ডকুমেন্টে কি আছে?'

'তা তিনি জানাননি।'

'ওটা যে তাঁর কাছে আছে, কর্তৃপক্ষ কি তা জানে?'

'অন্য এক সূত্র থেকে জানা গেছে, হপ্তাদুয়েক আগে হঠাৎ গভীর রাতে সাঈদ মুর্তজার বাড়িতে তল্লাশী চালিয়েছে সিক্রেট পুলিস। তবে কিছু পায়নি।'

'তারমানে কর্তৃপক্ষ কিছু সন্দেহ করেছে,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা মিলছে না।'

'কি মিলছে না?'

'আপনার জন্যে একটা মেসেজ নিয়ে নুরানিক যখন মি. মুর্তজায়েভের বাড়ি থেকে বেরুল, পুলিস তাকে সার্চ করল না কেন? কিংবা যখন সে সিটি শেরাটনে ঢুকছিল?'

প্রশ্নটা রানাকেও চিন্তিত করে তুলেছিল। অনেক ভেবে মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে সে নিজের মনে। ওর ধারণা, মুর্তজায়েভ জানেন ছেলেটি বাড়ি থেকে বেরোলেই তাকে সার্চ করা হবে, তাই তাকে শুধু কয়েকটা কথা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আর চেম্বারমেইডের কাছে দিয়েছিলেন চিরকুট। সার্চ করে কিছু না পেয়ে পিছু নেয়া হয়েছিল ছেলেটির, মেসেজ দেয়ার মুহূর্তে খুন করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাখ্যা এড়িয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল। 'এরমানে কি বেলগ্রেড পুলিস মরিয়া হয়ে উঠেছে? ওরা কি সাঈদ মুর্তজাকেও খুন করতে পারে?'

'মি. মুর্তজায়েভ গোটা বলকানে অসম্ভব জনপ্রিয়,' মাথা নেড়ে বললেন বিলিয়ার্ড। 'সরকার এত বড় ঝুঁকি নেবে না। খুন করা সম্ভব নয় বলেই তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। আমার ধারণা, নুরানিককেও সিক্রেট পুলিস খুন করেনি।'

'পুলিস ছাড়া আরও সংস্থা আছে, বিনা বিচারে মানুষ মারে?'

'অসংখ্য।'

লাইনটা ইতিমধ্যে ছোট হয়ে এসেছে। ওদের সামনে আর মাত্র তিন-চারজনকে দেখা যাচ্ছে। লাইনের শেষ মাথায় একটা কাঁচ ঘেরা সেন্ট্রি-বক্সে বসে আছে একজন লোক। সিভিল ড্রেসে রয়েছে সে, চেহারায় কর্তৃত্বের ছাপ। তার পাশে নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেন্ট্রি। ওদের পিছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একটা স্টেনগান। স্টেনগানের পাশে চৌকো একটা বোর্ড, বোর্ডের গায়ে অনেকগুলো তামার চাকতি ঝুলছে। প্রতিটি লোকের আইডি কার্ড পরীক্ষা করে দেখছে চেয়ারে বসা লোকটা। সে অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেই শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফর্ম দিচ্ছে সেন্ট্রি। তাতে উল্লেখ করতে হবে কি কাজে হেডকোয়ার্টারে এসেছে সে। সবশেষে তামার একটা চাকতি পাবে সে। কাজ

সেরে হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে যাবার সময় এই সেন্ট্রি-বক্সেই ফেরত দিতে হবে সেটা।

'খুব কড়াকড়ি দেখা যাচ্ছে,' বিড়বিড় করল রানা।

'হ্যাঁ,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'প্রায় প্রতি মাসেই আত্মঘাতী বোমা নিয়ে ভেতরে ঢুকছে গোপন রাজনৈতিক দলের ক্যাডাররা। সেজন্যেই গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢোকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

ওদের পালা এসে গেল। কাঁচ মোড়া খাঁচার ভেতর; ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা সেন্ট্রির সঙ্গে কথা বলছেন বিলিয়ার্ড, হাতে আইডি কার্ড। লোকটার পিছনে, স্টেনগানের পাশে, চেয়ারে বসা তালগাছের মত অস্বাভাবিক লম্বা লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। লোকটা অসম্ভব রোগাও বটে। ঠোঁটের উপর খুব ঘন ও চওড়া গোঁফ। সরু মুখটাকে ওপর-নিচে দু'ভাগ করে রেখেছে যেন গোঁফটা। মুখটা যেন ওপর-নিচে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল, মাঝখানে চওড়া গোঁফ সেঁটে কোন রকমে এক করে রাখা হয়েছে। শুকনো একটা ক্ষতচিহ্ন রয়েছে মুখে—ডান চোখের নিচ থেকে শুরু, নাকের পাশ ও গোঁফের নিচ দিয়ে চলে এসেছে চিবুক পর্যন্ত। লোকটার বাম হাত নার্ভাস ভঙ্গিতে স্টেনগানের ব্যারেলে আঙুল বোলাচ্ছে। রানা দ্বিতীয়বার তাকাতে চোখাচোখি হলো। বোঝা যায় কি যায় না, অতি সামান্য নড়ে উঠল চোখের পাতা, সে যেন চিনতে পেরেছে রানাকে। রানা তাকিয়ে আছে দেখে দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে নিল। তবে গোঁফের ফাঁকে ক্ষীণ বিদ্রূপাত্মক এক চিলতে হাসি দেখতে পেল রানা। আঙুলগুলো এখনও স্টেনগানের গায়ে, তবে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

'কি আশ্চর্য! এতক্ষণ লাইনে থাকার পর শুনতে হচ্ছে আরেক লাইনে দাঁড়াতে হবে!'

খাঁচার ভেতর বসে থাকা লোকটার দিকে এখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে রানা। রাগ যেন একের পর এক ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ছে ওর শরীরে। অনুভব করল টান পড়ছে পেশিতে, ও যেন একটা হিংস্র প্রাণী, শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যে ওর দিকে আবার তাকিয়েছে লোকটা, তারপর আর দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না। সে-ও সতর্ক চোখে পরীক্ষা করছে ওকে। তার পেশীতেও টান পড়ছে দেখে সন্তুষ্টি বোধ করল রানা। স্টেনগানের ব্যারেল থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে, আঙুলগুলো এখন টাইয়ের নট ঢিল করতে ব্যস্ত।

লাইন থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটছে ওরা, বিলিয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ডিপ্লোম্যাটদেরও এরা লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য করে? তার ওপর ইচ্ছেমত এক লাইন থেকে আরেক লাইনে পাঠায়? আপনারা প্রতিবাদ করেন না?'

খানিকটা বিব্রত দেখাল বিলিয়ার্ডকে। 'ভিড় বেশি হয় বলেই লাইনের ব্যবস্থা। গেস্টদের জন্যে আলাদা লাইন, সেটা বিনা নোটিসে জায়গা বদল করেছে।' রানার দিকে তাকাতে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল তাঁর। 'কি ব্যাপার বলুন তো, আপনার চোখ লাল কেন?'

রানা বলল, 'একটু পরে তাকান। সেন্ট্রিবক্সে একটা লোক বসে আছে।'

দাঁড়িয়ে পড়লেন বিলিয়ার্ড, সিগারেট ধরাবার ছলে বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। 'হ্যাঁ, দেখলাম,' বিড়বিড় করলেন তিনি।

'ওই লম্বা লোকটাই নুরানিককে খুন করেছে বলে আমার বিশ্বাস।'

অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা গলায় বিলিয়ার্ড জানতে চাইলেন, 'আপনি শিওর?'

'না। আমার বেডরুমে আলো খুব কম ছিল। তবে খুনীর সঙ্গে এই লোকটার আকার-আকৃতির আশ্চর্য মিল রয়েছে।'

'লোকটা কার্চিক জোডার যমজ ভাই জর্জিক জোডা, এবং ওর সমস্ত দুষ্কর্মের সহকারী,' বলেই পিছন ফিরলেন বিলিয়ার্ড। 'আসুন, ড. সিডাক কি বলেন শোনা যাক।'

উঠানের দ্বিতীয় লাইনটা ইতোমধ্যে অদৃশ্য হয়েছে, সেন্ট্রিবক্সের সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তামার চাকতি নিয়ে এলিভেটরে চড়ল ওরা, চারতলার করিডরে বেরিয়ে এসে দেখল দু'জন সশস্ত্র প্রহরী অপেক্ষা করছে। তারাই ওদেরকে পুলিস চীফের চেম্বারে পৌঁছে দিল।

বড় একটা কামরা; ফার্নিচার থেকে শুরু করে ওয়ালপেপার, দরজা-জানালার পর্দা, এমন কি ফ্লাওয়ার ভাস পর্যন্ত ধবধবে সাদা—শুধু রিভলভিং চেয়ারে ড. সিডাক নীল সুট পরে আছেন। কুশল বিনিময়ের পর গেটে কি ঘটে গেছে তার একটা বর্ণনা দিলেন বিলিয়ার্ড। তিনি থামতে তরুণীর পরিচয় জানতে চাইল রানা।

ড. সিডাককে গম্ভীর ও চিন্তিত দেখাচ্ছে। ধীরেসুস্থে একটা চুরুট ধরালেন। 'সেন্ট্রিবক্স থেকে রিপোর্ট পাবার পর একজন ইন্সপেক্টরকে ঘটনাটা তদন্ত করে দেখতে বলেছি আমি,' বললেন তিনি। 'আমাদের পলিটিক্যাল সেকশন বলছে, এ-ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না।' একটু থেমে রানার দিকে তাকালেন। 'কেউ বোধহয় আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে, আপনি যাতে সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা না করেই যুগোস্লাভিয়া ছেড়ে চলে যান।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে মেয়েটাকে কেন খুন করা হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি মনে করি তার পরিচয় জানাটা খুবই জরুরী।'

চুরুটে ঘন ঘন টান দিয়ে মুখের সামনে ধোঁয়ার একটা মেঘ তৈরি করলেন ড. সিডাক। 'তাহলে সব কথা খুলেই বলতে হয়। কদিন আগে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে টপ সিক্রেট একটা ডকুমেন্ট চুরি গেছে। চুরিটা করেছে ফটোস্ট্যাট মেশিনের একজন অপারেটর। সব মিলিয়ে সাতটা ফটোস্ট্যাট করা কাগজ। কিন্তু মেশিন অপারেটরের বাড়িতে তল্লাশী চালিয়েও কপিগুলো পাওয়া যায়নি। তাকে ইন্টারোগেট করে কোন লাভ হয়নি—মারা গেল, তবু মুখ খুলল না। আমরা আরও জানতে পারি, ডকুমেন্টটা যেদিন চুরি যায় সেদিন সন্ধের দিকে মিসেস মুর্তজায়েভ ওই লোকের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাই ওঁদের বাড়িটাও সার্চ করা হয়। কিন্তু কপিগুলো পাওয়া যায়নি।'

ঘরের ভেতর নীরব উত্তেজনা।

'লোকটার সঙ্গে তার স্ত্রীকেও পলিটিক্যাল সেকশনে ধরে আনা হয়,' নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ড. সিডাক। 'গত দু'হপ্তা ধরে ইন্টারোগেট করা হয়েছে তাকে, কিন্তু

কোন লাভ হয়নি। আজ তাকে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে জেল-হাজতে পাঠানো হচ্ছিল।'

রানা ও বিলিয়ার্ড নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

'আপনাকে আমি সরাসরি একটা প্রশ্ন করি, মি. রানা,' ড. সিডাক বললেন। 'আপনি কি ওই ডকুমেন্টটা নিতেই যুগোস্লাভিয়ায় এসেছেন?'

পুলিস চীফের চোখে চোখ রেখে রানা বলল, 'পাল্টা একটা প্রশ্ন করে জবাবটা দিতে চাই আমি, মি. সিডাক। ধরুন, সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে আমার দেখা করার সুযোগ হলো। এ-ও ধরুন, ফটোস্ট্যাট করা কপিগুলো তাঁর কাছে আছে, আমাকে তিনি সেগুলো দিলেনও। তারপর আমি কি ওগুলো নিয়ে যুগোস্লাভিয়া থেকে বেরিয়ে যেতে পারব? আপনাদের পুলিস বিভাগ কি সে সুযোগ আমাকে দেবে?'

'না। বেলগ্রেড সীল করে দেয়া হয়েছে, একটা পিঁপড়েও গলতে পারবে না।'

'কাজেই,' মৃদু হেসে বলল রানা, 'আমাকে এ-ধরনের প্রশ্ন করা স্রেফ সময়ের অপচয়।'

ও থামতেই বিলিয়ার্ড অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। 'আলভিক নুরানিক নামটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। কে সে, চেনেন নাকি?'

ক্ষীণ একটু হাসলেন ড. সিডাক, সেই সঙ্গে তাঁর চশমার কাঁচ ঝিক করে উঠল। 'হয়তো সাধারণ কোন ছিঁচকে চোর, বিদেশী ট্যুরিস্টের কামরায় ঢুকে কিছু চুরি করতে চেয়েছিল। ছিঁচকে চোর বলেই পুলিসের তালিকায় তার নাম পাওয়া যায়নি। সিটি শেরাটনে এ-ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে।'

'চুরি করতে এসে খুন হয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, আমি শুধু চুরি হওয়ার কথা বলছি। খুন হয়ে যাওয়াটা সত্যি বিস্ময়কর। এমনও হতে পারে চোরের সঙ্গে তার বন্ধু ছিল। সেই বন্ধুই তাকে খুন করেছে।'

বিলিয়ার্ড জানতে চাইলেন, 'আপনারা কি মি. রানার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনছেন, ড. সিডাক?'

'তদন্ত চলছে, কাজেই এখুনি কিছু বলতে পারছি না,' আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন পুলিস চীফ। 'তবে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ওঁকে আমরা নিরপরাধ বলেই গণ্য করব।'

'ধন্যবাদ,' এতক্ষণে স্বস্তিবোধ করলেন বিলিয়ার্ড, প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালেন। 'এবার অন্য প্রসঙ্গ। যে জন্যে মি. রানা যুগোস্লাভিয়ায় এসেছেন। ওঁর কাছে লেখক-সাহিত্যিকদের একটা তালিকা আছে। আমি জানি, লেখক সংঘই তাঁদের সঙ্গে ওঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তার আগে লেখক সংঘকে পুলিসের অনুমতি পেতে হবে, তাই না?'

'লেখক সংঘের দফতর সম্পাদিকা লিলিয়ান তো প্রায়ই ব্রিটিশ দূতাবাসে যায়, আপনার সঙ্গে তার সম্পর্কও খুব ভাল,' বললেন ড. সিডাক। 'তাকে ধরুন না, সেই সবার সঙ্গে মি. রানার পরিচয় করিয়ে দেবে।'

কথা না বলে চুপ করে আছে রানা, বিস্মিত হলেও বুঝতে দিচ্ছে না।

'তার সঙ্গে কোথায় দেখা করব? আপনার বাড়িতে?' জিজ্ঞেস করলেন

বিলিয়ার্ড।

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন পুলিস চীফ, তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনারা বরং কাল ওকে ওর অফিসে ধরুন। কিংবা, আজ যেহেতু রোববার, ওকে ওদের ফ্ল্যাটেই পাবেন।'

মীটিং আছে, তাই সম্মানীয় অতিথিদের আপ্যায়ন করা গেল না, এ-কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন ড. সিডাক। বিদায় নিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল ওরা। নিচের উঠানে নেমে প্রথম সেন্ট্রিবক্সে উঁকি দিল রানা, কিন্তু কালো কোট পরা তালগাছকে সেখানে দেখা গেল না।

'ড. সিডাক রাতে বললেন, মি. মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা হবে না, অথচ এখন তিনি নিজেই বলে দিলেন কিভাবে দেখা করতে হবে, ব্যাপারটা কেমন হলো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কারণটা আপনিও জানেন,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'ড. সিডাক চাইছেন টপ সিক্রেট ডকুমেন্টটা আপনিই সাঈদ মুর্তজার বাড়ি থেকে বের করে আনুন।'

'এ বি সি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমাকে তাঁর বাড়িতে ঢোকার অনুমতি দেয়া হবে। তিনি আমাকে ডকুমেন্টটা দেবেন। তারপর পুলিস ওটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে?'

'হ্যাঁ। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। পুলিস এমন কি ডকুমেন্ট নিয়ে আপনাকে সীমান্ত পর্যন্ত যেতেও দিতে পারে, ধরবে একেবারে শেষ মুহূর্তে। রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য পাচার করার অভিযোগে সাঈদ মুর্তজায়েভ ও আপনাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করতে কোন অসুবিধেই হবে না।'

'হুম।' দু'জন একই ধারায় চিন্তা করছে, বুঝতে পেরে গম্ভীর হয়ে গেল রানা।

বিলিয়ার্ড বিড়বিড় করে বললেন, 'ব্যাপারটা নিয়ে মি. ফোলির সঙ্গে আলাপ করতে হবে।'

'মি. ফোলির সঙ্গে আলাপ করতে হবে? কেন? তিনি কি আপনার বস্?'

'না, ঠিক তা নয়, তবে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে জানানো দরকার।'

'নুরানিক আমাকে মেসেজ দিতে এসেছিল, এটাও তাঁকে বলবেন নাকি?'

'বলতে আমি বাধ্য, মি. রানা। এটা আমার ডিউটি।'

'তিনি আপনার বস নন, অথচ সব কথা তাঁকে আপনি বলতে বাধ্য, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝলাম না, মি. বিলিয়ার্ড।'

চেহারায় অস্বস্তি, বিলিয়ার্ড বললেন, 'আমাদের দূতাবাসে এ-ধরনের পরিস্থিতি তিনিই সামলান। এরবেশি আপনাকে কিছু বলতে পারছি না।'

'বেলগ্রেডে মার্কিন দূতাবাস নেই, তবে শুনেছি সিআইএ এজেন্ট আছে,' বলল রানা। 'ইনিই কি তিনি?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বিলিয়ার্ড বললেন, 'সত্যি দুঃখিত। তবে সব কথাই তাঁকে আমার জানাতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে যদি কিছু বলেন, তা-ও। এখানে আপনি কাউকেই বিশ্বাস করতে পারেন না, মি. রানা। এমন কি আমাকেও না,' শেষ দিকে কর্কশ হয়ে উঠল তাঁর গলার স্বর।

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রানা। 'লেখক সংঘের দফতর সম্পাদিকা লিলিয়ানের সঙ্গে ড. সিডাকের কি সম্পর্ক? আপনি ড. সিডাকের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন কেন?'

'ড. সিডাকের মেয়ে আর লিলিয়ান নোভা সমবয়েসী, পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'নিরাপত্তাজনিত ফি একটা সমস্যা আছে, তাই ড. সিডাকের বাড়িতেই থাকে নোভা। শুধু ছুটির দিনগুলো নিজের ফ্ল্যাটে যায়।'

'আজ কি তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার দু'দিক ভাল করে দেখে নিলেন বিলিয়ার্ড। 'আপনি কি চান নোভার সঙ্গে কথা বলার সময় আমিও উপস্থিত থাকি?'

'কি কথাবার্তা হয় আপনি যাতে মি. ফোলিকে রিপোর্ট করতে পারেন?'

খোঁচাটা নীরবে হজম করলেন বিলিয়ার্ড।

'না, আমি একাই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বলল রানা।

'ঠিক আছে,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'তবে খুব সাবধানে থাকবেন, মি. রানা। ভুলে যাবেন না, আপনি আসলে ক্ষুরের ওপর দিয়ে হাঁটছেন।'

চার

রোলেক্স রিস্টওয়াচে বিকেল চারটে, স্যুইট থেকে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। সরাসরি উল্টোদিকে ছোট্ট একটা অ্যালকোভ স্যালন, লাল লাউঞ্জ চেয়ারে দু'জন লোক মুখোমুখি বসে আছে, পায়ের কাছে একজোড়া ব্রিফকেস। কপাল ঢাকা হ্যাট দুটো সামান্য একটু নড়ল কি নড়ল না, দেখেও না দেখার ভান করে স্যুইটে তালা লাগাল রানা, করিডর ধরে সিড়ির দিকে এগোল। দু'জোড়া চোখ অনুসরণ করছে ওকে, পিঠে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো। তবে কিছু ঘটল না, নিরাপদেই নিচের লাউঞ্জে নেমে এল ও।

লাউঞ্জে ইউনিফর্মের ছড়াছড়ি। হোটেলের নতুন ও পুরানো বোর্ডার, তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসা লোকজন আর স্টাফের পরিচয়-পত্র চেক করছে পুলিস অফিসাররা। গায়ে ইউনিফর্ম নেই, অথচ সঙ্গে অস্ত্র আছে, এমন কিছু লোককেও ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। এরাও সম্ভবত সিক্রেট পুলিসের সদস্য, পলিটিক্যাল ক্রাইম সেকশনে কাজ করে। রানাকে দেখে লোকগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। তবে কেউই সরাসরি ওর দিকে তাকাচ্ছে না। একজনকে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে নিচু গলায় কথা বলতে দেখল রানা।

চাবিটা ডেস্কে জমা রেখে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল ও। সামনেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, ওর সম্মতি নিয়ে পোর্টার হাত তুলতেই লাইনের প্রথম গাড়িটা এগিয়ে এল। ধাপ ক'টা দ্রুত টপকে ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরল সে, দ্বিতীয়বার স্যালুট করল রানাকে। তার হাতে একশো দিনারের একটা নোট গুঁজে দিয়ে গাড়িতে

উঠল রানা। ট্যাক্সি চলতে শুরু করেছে, রাস্তার আরেক পাশের পার্কিং এরিয়া থেকে স্টার্ট নিল কালো একটা মার্সিডিজ।

হোটেল থেকে লিলিয়ান নোভার ফ্ল্যাট গাড়িতে বারো মিনিটের পথ। ফেউটাকে খসাবার জন্যে ছ'মিনিটের মাথায় জেনারেল সুদভিক এভিনিউয়ে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল রানা। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে যেতে রাস্তা পেরুল, পিছু নেয়া মার্সিডিজ এখনও বাঁক ঘোরেনি। একটা দোকানের কাঁচে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে ও।

মার্সিডিজ নয়, বাঁক ঘুরল একটা লোক। গায়ে কালো লেদার জ্যাকেট, হাতে চকলেট রঙের ব্রিফকেস। রাস্তা পেরোয়নি, সে-ও একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শো-কেসের কাঁচে চোখ রেখে ওকে লক্ষ করছে।

ফুটপাথ ধরে হাঁটা ধরল রানা, মাথায় প্রাসঙ্গিক দুশ্চিন্তা। ঝুঁকি নিতে হবে জানত, কিন্তু ভাবেনি বেলগ্রেডে পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি এরকম জটিল হয়ে উঠবে। সিক্রেট পুলিস প্রায় নিশ্চিতভাবে জেনে ফেলেছে যুগোস্লাভিয়ায় কেন এসেছে ও। তারাই এখন চাইছে রানা সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা করে টপ সিক্রেট ডকুমেন্টটা বের করে আনুক। বেলগ্রেড যখন সীল করে দেয়া হয়েছে, ডকুমেন্ট নিয়ে এখান থেকে কিভাবে পালাবে ও? তার ওপর, ওকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে, সম্ভব হলে সাঈদ মুর্তজায়েভকেও যুগোস্লাভিয়া থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে। এই উত্তপ্ত ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে কিভাবে তা সম্ভব!

মাথা ঘামাও, উপায় একটা বেরুবেই। তবে তার আগে ফেউটাকে খসাও।

এ-গলি ও-গলি ধরে দশ মিনিট হাঁটল রানা। কালো লেদার জ্যাকেট পিছু লেগে আছে জোঁকের মত। এই মুহূর্তে চওড়া একটা রাস্তায় রয়েছে ও, রাস্তার বাম পাশে উঁচু পাথুরে পাঁচিল, ডান পাশে বাড়ি-ঘর। আরও খানিক এগোতে ডান পাশে একটা গলির মুখ। রানা জানে, এই গলির ভেতরই লিলিয়ান নোভার ফ্ল্যাট। গলিটায় না ঢুকে পঞ্চাশ গজ সোজা এগোল রানা, আরেক গলির মুখে পৌঁছে ইতস্তত করতে লাগল, যেন পথ হারিয়ে দিশেহারা বোধ করছে। তারপর ঘুরে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দু'তিন পা এগোল। লোকটা এখন ওর মুখোমুখি, বিশ গজ সামনে—রানাকে ফিরে আসতে দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে। পাশেই একটা একতলা বাড়ির বন্ধ দরজা ও কলিংবেল। হাত তুলে বোতামে চাপ দিল সে। জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ফোল্ডার বের করছে, দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল এক মহিলা। হাতের ফোল্ডারটা দেখিয়ে তাকে কিছু বলল লোকটা। মহিলা সরে দাঁড়াতে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল সে। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

সুযোগটা সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগাল রানা। নির্জন রাস্তা ধরে ছুটল, পঞ্চাশ গজ পেরিয়ে এসে ঢুকে পড়ল প্রথম গলিটায়। লোকটা সম্ভবত ভুয়া বীমা কোম্পানির দালাল সেজেছে, এখনও বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসেনি।

ঠিকানা মিলিয়ে লিলিয়ান নোভার ফ্ল্যাট বাড়িটা খুঁজে বের করতে রানার কোন অসুবিধে হলো না, তবে লোহার গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর পথ আগলে দাঁড়াল যমদূতের মত প্রকাণ্ডদেহী দু'জন সশস্ত্র পুলিস গার্ড। দু'জনের হাতেই বাগিয়ে ধরা স্টেন গান।

'আমি মাসুদ রানা, ব্রিটিশ সাবজেক্ট,' ওদেরকে বলল রানা। 'লিলিয়ান নোভার সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

প্রথম গার্ড তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল, 'মাসুদ রানা?'

দ্বিতীয় গার্ড মাথা ঝাঁকিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'আইডি, প্লীজ।'

পরিচয়-পত্রটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল সে, ফিরিয়ে দিয়ে ছোট করে মাথা ঝাঁকিয়ে আবার বলল, 'সোজা তিনতলায় চলে যান।'

তিনতলায় উঠে এসে কলিংবেল বাজাল রানা। দরজা খুলল পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছরের এক তরুণী, কোমরে আঁটসাঁট জিনস আর গায়ে টি-শার্ট। 'মি. রানা?' হাসিমুখে জানতে চাইল। রানা মাথা ঝাঁকাতে একপাশে সরে দাঁড়াল। 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

দরজা টপকে ভেতরে ঢুকল রানা। মেয়েটির পিছু নিয়ে ছোট্ট একটা করিডর পেরুল, তারপর কারুকাজ করা দরজা দিয়ে মাঝারি আকারের একটা কামরায় ঢুকল। খোলা জানালা দিয়ে পাহাড়, বনভূমি আর নদী দেখা যাচ্ছে। একটা সোফা দেখিয়ে ওকে বসতে অনুরোধ করল মেয়েটি, বলল, 'আমি ওর বান্ধবী, সিলভিয়া। আপনি আরাম করে বসুন, লিলিয়ান হাতের কাজটা শেষ করেই আপনার সঙ্গে দেখা করবে। আপনাকে চা দিতে বলব, নাকি কফি?'

'কফি চলতে পারে, ধন্যবাদ।' মেয়েটি চলে যেতে চোখ ঘুরিয়ে কামরাটা দেখছে রানা। একদিকে দেয়াল জুড়ে বুকশেলফ, বইপত্রে ঠাসা। সারা ঘরে পেইন্টিং আর স্কাল্পচার ছড়িয়ে আছে। ফ্রেমে আটকানো কিছু ক্যানভাস দেয়ালে ঝুলছে, কিছু বুকশেলফে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। এক কোণে একটা ইজেল দেখা গেল, ক্যানভাসের রঙ এখনও শুকায়নি। বেশিরভাগ ছবিতেই প্রকৃতির সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস।

স্কাল্পচারগুলো ধাতব মূর্তি। ছোট-বড় সব আকৃতিরই আছে। খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিরূপ—কারখানার শ্রমিক, কৃষক, মাঝি, সশস্ত্র সৈনিক। মার্শাল টিটোর আবক্ষ মূর্তিটা রাখা হয়েছে নিচু টেবিলে। বিশেষ করে একটা স্কাল্পচার রানার দৃষ্টি কেড়ে নিল। প্রায় দু'ফুট উঁচু সেটা, রাখা হয়েছে ফায়ারপ্লেসের মাথায়। ব্রোঞ্জের কাজ, হাঁটুর ভাঁজ খুলে সিধে হতে যাচ্ছে এক স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন পুরুষ। তার মাথা দৃঢ় ঘাড়ের উপর পিছন দিকে হেলানো, তাকিয়ে আছে আকাশ বা স্বর্গপানে।

সোফা ছেড়ে উঠে এল রানা, মূর্তিটা ভাল করে দেখছে। নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে বুঝতে পারল, অসম্ভব ভারী।

'উনি আমার বাবা।'

মিষ্টি কণ্ঠ, বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ। শুনে এমন চমকে উঠল রানা, আরেকটু হলে হাত থেকে মূর্তিটা ফেলে দিত। কিছু বলার আগে মূর্তিটা সাবধানে রেখে দিল ও, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। সাদা জিনসের ট্রাউজার পরেছে মেয়েটি, গায়ে ঢোলা ম্যাগাজিন শার্ট। মুখ তাজা একটা ফুল বললেই হয়, কোন রকম প্রসাধন ব্যবহার করেনি। দীর্ঘ কালো চুলকে বিশাল একটা বেণী করে কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে আনা হয়েছে, শেষ প্রান্ত হাঁটু ছুঁতে চায়। 'মিস লিলিয়ান নোভা?' জিজ্ঞেস

করল মন্ত্রমুগ্ধ বানা।

ছোট করে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। একপাশে সরে গেল সে, মধ্যবয়স্কা এক মহিলাকে পথ করে দিল। হাতের ট্রেটা নিচু একটা টেবিলে রেখে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

'একজন ফলো করছিল, তাই পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গেল।' মেয়েটি এত সুন্দরী, রানা চোখ ফেরাতে পারছে না।

'ফলো করছিল?' নোভার চোখে কৌতুক ঝিক্ করে উঠল। 'নিশ্চয়ই কোন মেয়ে?' রানার মুগ্ধদৃষ্টি চোখ এড়ায়নি ওর।

'আরে না!' রানা অনুভব করল গরম হয়ে উঠছে ওর মুখ। 'ইউনিফর্ম না থাকলেও, লোকটা সম্ভবত সিক্রেট পুলিসই হবে। হাতে একটা ব্রিফকেস ছিল।'

পট থেকে কাপে কফি ঢালার সময় ঘাড় ফিরিয়ে বারবার রানাকে দেখছে নোভা। কি একটা আকর্ষণ সে-ও যেন এড়াতে পারছে না। 'হ্যাঁ, পুলিসই হবে। এটা একটা পুলিসী রাষ্ট্র, মি. রানা।' হঠাৎ করেই চোখের হাসি নিভে গেল, সেখানে ফুটে উঠল সন্ত্রস্ত একটা ভাব।

'আপনি কি কোনও কারণে ভয় পাচ্ছেন, মিস নোভা? কোন রকম বিপদের মধ্যে আছেন?'

'শুধু নাম ধরলেই হবে, মি. রানা,' বলল নোভা। 'কেন, আপনি জানেন না? যুগোস্লাভিয়ায় সবাই আমরা বিপদের মধ্যে আছি। এমন কি বিদেশীরাও, আপনিও বিপদ মুক্ত নন।' রানার হাতে একটা কাপ ধরিয়ে দিল। 'আপনার পৌঁছাতে দেরি হয়েছে, এদিকে আমিও আপনাকে বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি। আসলে হপ্তায় এই একটা দিনই শুধু স্কাল্পচার আর পেইন্টিং নিয়ে কাজ করার সুযোগ পাই তো!'

'ছুটির দিনে আজ তাহলে আপনাকে বিরক্তই...'

'না-না, আমি একটুও বিরক্ত হচ্ছি না!' তাড়াতাড়ি বলল নোভা। 'বরং আপনি আসায় একটু বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পেলাম।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে, মায়াভরা চোখে বিষাদের ছায়া। 'বলুন তো, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি।'

'যুগোস্লাভিয়ার নামকরা লেখক-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই আমি,' বলল রানা। 'তাঁরা যদি নিজেদের কোন লেখা লন্ডন থেকে ছাপতে চান, আমি তার ব্যবস্থা করব। ব্রিটিশ দূতাবাসের মি. বিলিয়ার্ড ও বেলগ্রেড পুলিস চীফ ড. সিডাকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ওঁরাই বললেন, ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেছেন আপনি, আপনার অনুবাদের হাতও খুব ভাল, প্রয়োজনে আপনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারবেন।'

'বাবা মারা যাবার পর, বাবার ওই দুই বন্ধুই আমার ভাল-মন্দ সব কিছু দেখাশোনা করছেন,' বলল নোভা। 'স্বভাবতই ওঁরা আমার একটু বেশি প্রশংসা করেন। তবে অনুবাদের কাজ পেলে সত্যি আমি খুশি হব। তা আপনি ঠিক কার কার সঙ্গে দেখা করতে চান, মি. রানা? আপনার কাছে কোন তালিকা আছে?'

'মিস্টারটা বাদ দিতে পারেন,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, তালিকা একটা আছে বটে।

কিন্তু ভাবছি আমি কি আমার পছন্দ মত যে-কোন লেখকের সঙ্গে দেখা করতে পারব?'

'আপনি আসলে জানতে চাইছেন, দেখা করার পুলিসী অনুমতি পাবেন কিনা, এই তো?' ক্ষীণ হাসি ফুটল নোভার ঠোঁটে। 'আপনি আসলে ভাগ্যবান, রানা। সিডাক আঙ্কেলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আনঅফিশিয়াল হলেও, তিনি অনুমতি দিয়েছেন। আপনি প্রথমে কার সঙ্গে দেখা করতে চান বলুন, আমি ব্যবস্থা করছি।'

'যতটুকু বুঝতে পারছি, সাঈদ মুর্তজায়েভ সম্পর্কে সবাই কমবেশি স্পর্শকাতর,' বলল রানা। 'প্রথমে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়?'

রানার মুখোমুখি একটা সোফার হাতলে বসেছিল নোভা, কথাটা শুনে উঠে দাঁড়াল সে, নিঃশব্দে ঘুরে খোলা জানালার দিকে এগোল। কামরার ভেতর অস্বস্তিকর নীরবতা জমাট বাঁধছে। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে নোভা, তা সত্ত্বেও তার আড়ষ্ট ভাবটা রানার দৃষ্টি এড়ায়নি। ওর মনে হলো, কি একটা আবেগ চেপে রাখার জন্যে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে মেয়েটা।

ও কিছু বলতে যাবে, জানালার দিকে পিছন ফিরল নোভা, বলল, 'সারাটা দিন ঘরে বসে কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি। আপনার আপত্তি না থাকলে চলুন না বাইরে থেকে একটু হেঁটে আসি?'

রানা ইতস্তত করছে। 'বাইরে···'

এগিয়ে এল নোভা। জোর করে হলেও, আবার হাসছে। 'আপনি কি আমাদের ক্যালেমেগডান দেখেছেন? দেখে না থাকলে সুযোগটা হাতছাড়া করবেন না, কারণ আমার মত ভাল গাইড আর জীবনে আপনি না-ও পেতে পারেন।'

অগত্যা রাজি হলো রানা। এখুনি আসছি বলে কামরা থেকে এক রকম ছুটেই বেরিয়ে গেল নোভা। পাঁচ মিনিট পর আবার যখন ফিরল, বেলী ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে উঠল কামরার বাতাস। 'চলুন,' ফিসফিস করে তাগাদা দিল সে।

সেন্টের নামটা আর জিজ্ঞেস করা হলো না, তার আগেই নোভার পিছু নিয়ে ঘরে ঢুকল তার সমবয়েসী সেই মেয়েটি, সিলভিয়া। 'আমি কি তোদের সঙ্গে থাকব?' নোভাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'তোর ছবির কাজ তো এখনও শেষ হয়নি,' উত্তরে বলল নোভা। 'তাছাড়া, ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার অফিশিয়াল আলাপও আছে।' রানার হাত ধরে টান দিল সে, দরজার দিকে এগোচ্ছে।

করিডর হয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে নামছে, দরজা থেকে সিলভিয়া বলল 'বেশি দূরে কোথাও যাবি না, নোভা। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরবি, কেমন? আর, হ্যাঁ, গার্ডদেরও সঙ্গে নে।'

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ল নোভা, ঘুরে বলল, 'এত ভয় নিয়ে কি বাঁচা যায়, তুইই বল? নিজের ইচ্ছামত একা কোথাও হাঁটতেও পারব না?'

ম্লান মুখে চুপ করে থাকল সিলভিয়া।

'ভয় নেই, আমার কিছু হবে না,' গলা নরম করে আবার বলল নোভা। 'দশ্চিন্তায় না ভুগে, যা, নিজের কাজটা শেষ কর।'

'না, বলছিলাম কি, সাবধানের মার নেই…' শুরু করল সিলভিয়া।

তাকে থামিয়ে দিয়ে নোভা বলল, 'আমি সাবধানেই থাকব, সিলভিয়া। তাছাড়া, একাও তো যাচ্ছি না।' হঠাৎ হেসে উঠল সে। 'প্রয়োজনে উনি আমাকে অবশ্যই রক্ষা করবেন। কি, করবেন না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!' কিছু একটা বলতে হয় তাই বলা। 'নিরস্ত্র অবস্থায় যতটুকু সম্ভব আর কি।' রানা হাসছে না।

সিলভিয়াকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রানাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গেল নোভা। তবে বাড়ির গেটে আবার তাকে বাধা দেয়া হলো। সশস্ত্র গার্ডরা একা তাকে বেরুতে দিতে রাজি নয়। তাদেরকে রীতিমত চোখ রাঙিয়ে নোভা বলল, 'পুলিস চীফের মেয়ে সিলভিয়ার নির্দেশও তোমরা অমান্য করবে? অবশ্য চাকরির মায়া না থাকলে আমার কিছু বলার নেই।'

রানাকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল নোভা। গার্ড দু'জন অসহায় ভঙ্গিতে ভেতরেই দাঁড়িয়ে থাকল।

রাস্তায় পা দিয়েই প্রথমে রানা কালো লেদার জ্যাকেটের খোঁজে তাকাল এদিক ওদিক। ফাঁকা রাস্তা, কেউ কোথাও নেই। তবু স্বস্তিবোধ করছে না। গলিটা পার হয়ে খোলা মাঠে পৌঁছাল ওরা, আড়াআড়িভাবে পার হচ্ছে সেটা। রানা শুনছে কিনা খেয়াল নেই নোভার, আপনমনে কথা বলে যাচ্ছে। বেলগ্রেড শহরে থাকছে বটে, কিন্তু এটা তার পছন্দের শহর নয়। প্রাচীন শহর বেলগ্রেড, ওল্ড টাউনের প্রতিটি ভবন কমপক্ষে দেড়শো বছরের পুরানো। তারই পাশে নিউ টাউনকে কংক্রিট আর কাঁচের জঙ্গল বললেই ভাল মানায়। এখানে প্রাণ নেই, শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই। নোভার আদর্শ শহর কোটর। মন্ট্রিনিগ্রোর ওই শহরেই তার জন্ম। পাথুরে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নিরাপদ আশ্রয়। মা-বাবা মারা যাবার পরও পৈত্রিক বাড়িটা বিক্রি করেনি সে, মাঝে মধ্যে লম্বা ছুটি পেলে বেড়িয়ে আসে।

নোভা একটু থামতেই রানা জানতে চাইল, সে তো ড. সিডাকের বাড়িতেই থাকে, তাই না? কেন?

প্রশ্ন শুনে আবার শুরু করল নোভা। আজ যেন তাকে কথা বলার নেশায় পেয়েছে। নোভার মা-বাবা ও ড. সিডাক, সবাই ওঁরা মন্ট্রিনিগ্রোর পডগোরিকায় পরস্পরের প্রতিবেশী ছিলেন। নোভার বয়স যখন মাত্র ছয়, ওর বাবা খুন হন। সিলভিয়া, ড. সিডাকের মেয়ে, সেই ছোটবেলা থেকেই নোভার বান্ধবী। দু'জনে একই স্কুলে লেখাপড়া করত। বাবা মারা যাবার দু'বছর পর মাকেও হারাল নোভা। তিনি ক্যান্সারে মারা যান। নোভা তখন বেলগ্রেডে নিজেদের ফ্ল্যাটেই ছিল, চাচা-চাচীর সঙ্গে। সে-সময় ড. সিডাক পুলিস ইন্সপেক্টর ছিলেন। বাবা ও মা মারা যাবার পর নোভার নিরাপত্তা নিয়ে সঙ্কট সৃষ্টি হয়। কি ধরনের সঙ্কট, নোভা তা ব্যাখ্যা করল না। শুধু জানাল, ড. সিডাক তাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যান। সেই থেকে সিলভিয়ার সঙ্গেই আছে সে। সিলভিয়ার লেখাপড়া মাঝপথে থেমে গেলেও, একটা ফ্যাশন হাউস দাঁড় করিয়ে ভালই রোজগার করছে সে। আর নোভা কলেজে দু'বছর পড়ার পর লন্ডনে চলে যায়, অক্সফোর্ড থেকে

মাস্টার্স করে দেশে ফিরে চাকরি নিয়েছে। সিডাক আংকেল তার থাকা-খাওয়া আর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন, সেজন্যে নোভা তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। অজ্ঞাতপরিচয় আরও এক ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ সে। তিনিই নোভার লেখাপড়ার সমস্ত খরচ বহন করেছেন। এ তথ্য সিডাক আঙ্কেলই দিয়েছে তাকে। ভদ্রলোক বাবার বন্ধু, নোভা শুধু এটুকুই জানে। তাঁর আসল পরিচয় সিডাক আংকেলও নাকি জানেন না।

তারপর এক সময় খুব লজ্জা পেল নোভা, বলল, 'ছি-ছি, আমি শুধু নিজের কথাই বলে যাচ্ছি! এবার আপনি বলুন, রানা। কে আপনি? আমার···কোত্থেকে এলেন?'

আমার···কোত্থেকে এলেন? নোভার প্রশ্নটা নিয়ে চিন্তা করছে রানা। 'আমার' বলার পর মেয়েটা বিরতি নিল কেন? ও কি বলতে চেয়েছে, 'আমার জীবনে কোত্থেকে এলেন?' আশ্চর্য এক বিষণ্নতায় ছেয়ে গেল রানার মন। আকর্ষণটা যে একতরফা নয়, এটা মানতেই হবে। প্রথম দর্শনেই দু'জনের রক্ত-মাংসের মেকানিজম কোথাও ক্লিক করেছে। একেই হয়তো বলে অনুকূল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু পরস্পরের প্রতি আরও দুর্বল হয়ে পড়ার আগে, এখনই লাগাম টেনে ধরা দরকার, তা না হলে দু'জনকেই পস্তাতে হতে পারে। বেলগ্রেড সম্ভবত দু'জনের জন্যেই বিপজ্জনক কারাগার। এখানে বিপদ হলো নগ্ন বাস্তবতা। কঠিন সত্য হলো আকস্মিক মৃত্যু। স্থান-কাল-পাত্র, সবই ভুল। 'আমি ক্ষুদ্র একজন মানুষ,' দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল রানা। 'নিজের সম্পর্কে বলার তেমন কিছুই নেই।'

'আপনি কি সবার কাছেই নিজেকে গোপন রাখেন? নাকি শুধু আমার কাছে লুকিয়ে রাখছেন?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল নোভা। 'আপনার চোখ বলছে আপনি ডসটোয়েভস্কি আর টলস্টয় পড়েছেন। ঠোঁট বলছে, শেক্সপীয়ার মুখস্থ। আপনার গলার আওয়াজ শুনে মনে হয় সমুদ্রকে শাসন করার ক্ষমতা রাখেন। তারপরও বলবেন আপনি ক্ষুদ্র? আর আমি তা বিশ্বাস করব?' রানাকে কেমন যেন থতমত খেয়ে যেতে দেখল সে। ফলে হেসে উঠল। 'কি জানি আজ আমার কি হয়েছে! কারও সঙ্গেই কথা বলি না, এত কথা তো নয়ই। জানি না কি ভাবছেন আপনি। ভুলে যান, প্লীজ। আসুন, কাজের কথা বলি।'

'নোভা, আমি জানতে চেয়েছি সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব কিনা,' বলল রানা। 'কিন্তু প্রশ্নটা শুনে আপনি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন।'

'ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা ভুলে থাকাই ভাল,' বিড়বিড় করল নোভা। 'হ্যাঁ, তার সঙ্গে আপনার দেখা হবে। লিখিত সরকারী অনুমতি কাল সকালে আপনার হোটেলে পাঠিয়ে দেব আমি। সঙ্গে বাড়ির ঠিকানাও থাকবে।'

'আমি একা যাব, আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন না?' জানতে চাইল রানা।

'সম্ভব হলে থাকতাম, কিন্তু সম্ভব নয়,' বলল নোভা, গলার স্বর কেমন যেন কঠিন শোনাল। 'না, সম্ভব নয়। প্লীজ, এ-ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করবেন না।'

এরপর দু'জনেই চুপ করে গেল। তালটা যেন কেটে গেছে।

ক্যালেমেগডান পাহাড়শ্রেণীর ঢালে চড়লে দানিয়ুব আর সাভা নদীর সঙ্গমস্থলটা

পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। বেলগ্রেডকে ধ্বংস করার জন্যে কয়েকশো বছর ধরে বারবার এই উঁচু এলাকাটি দখল করার চেষ্টা হয়েছে: হামলা করেছে গথ, কেল্ট, রোমান, তুর্কী, হ্যাঙ্গেরিয়ান, অস্ট্রিয়ান ও নাৎসীরা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বেলগ্রেডকে কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ বার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সার্বদের গোঁয়ার্তুমিই এই সব আক্রমণের প্রধান কারণ ছিল। বেলগ্রেড চিরকালই ক্ষুদ্র জাতি সত্তাকে দাবিয়ে রেখে শোষণ করতে চেয়েছে। এ-সব কথা রানাকে বলার সময় নোভার গলায় ক্ষোভ আর জেদ প্রকাশ পেল। প্রাসঙ্গিকভাবেই নোভার হাতে গড়া ব্রোঞ্জ মূর্তিটার কথা মনে পড়ে গেল রানার–সিধে হয়ে দাঁড়াবার সংগ্রাম করছে।

পার্কে প্রচুর গাছ, কিন্তু প্রায় সবগুলোই ন্যাড়া। কুয়াশা কেটে যাওয়ায় অনেক লোকই বেড়াতে এসেছে। আশপাশে পুলিস না থাকলেও, তরুণ সৈনিকদের দলবেঁধে ঘুরে বেড়াতে দেখল রানা। ওদের সঙ্গে তরুণীরাও আছে। পিকনিক পার্টির সঙ্গে এসেছে গৃহবধূ আর শিশুরা। একটা বেঞ্চও খালি নেই, সব দখল করে নিয়েছে বুড়ো-বুড়িরা।

মন্টিনিগ্রো চিরকালই স্বাধীন একটা দেশ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে, কিন্তু সার্বিয়া সব সময় চেষ্টা করেছে দেশটাকে কিভাবে গ্রাস করা যায়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে ঘুষ দিয়ে সার্ব ব্যবসায়ী আর রাজনীতিকরা মন্টিনিগ্রোর খাস জমি, বনভূমি, লেক, পাহাড় ইত্যাদি লীজ নিয়েছে। নব্বুই সালে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট নিজে কিনে নিয়েছেন কোটর ও বাডভা এলাকার বিশাল জঙ্গল, সেখানে তিনি প্রতি বছর বন্যপ্রাণী শিকার করতে যান। এমন কি মাছ ধরার অধিকার থেকেও ইদানীং বঞ্চিত করা হচ্ছে স্থানীয় জেলেদের, সার্ব ব্যবসায়ীরা ইজারার নামে সাগরকে ভাগ করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে।

ঢাল বেয়ে ক্যালেমেগডান রিজ-এ উঠে এল ওরা। চারপাশে তাকিয়ে খানিকটা হকচকিয়ে গেল রানা, সেটা লক্ষ করে খিলখিল করে হেসে উঠল নোভা। 'জানতাম আপনি অবাক হবেন,' হাসতে হাসতেই বলল সে। 'সত্যি কথা বলতে কি, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখাবার জন্যেই এখানে আপনাকে নিয়ে এসেছি।'

ওদের আগেই চূড়ায় উঠে এসেছে অনেকে। জোড়ায় জোড়ায় আরও উঠছে। সবাই তারা তরুণ-তরুণী, পরস্পরের হাত ধরে ছুটোছুটি করছে। ব্যস্ততার কারণটা একটু পরেই বুঝতে পারল রানা। ক্যালেমেগডানের চূড়ায় অসংখ্য গুহা দেখা যাচ্ছে, সেই গুহা কে কার আগে দখল করবে তারই প্রতিযোগিতা চলছে। প্রতিটি গুহার ভেতর পাথরের তৈরি বেঞ্চ আছে, সেই বেঞ্চে বসে গল্প করছে তরুণ-তরুণীরা। গুহার চেয়ে সংখ্যায় বেশি যুগল প্রেমিক-প্রেমিকারা, ফলে যারা দেরি করে এসেছে তাদেরকে প্রাইভেসি পাওয়ার জন্যে বোল্ডারের আড়ালে সরে যেতে হলো। ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে নোভা আর রানা। 'বলতে পারবেন, কি ঘটছে এখানে?'

কি বলবে বুঝতে পারছে না রানা। পার্কে পরস্পরের হাত ধরে হাঁটতে দেখা গেলেও, কেউ কাউকে জড়িয়ে ধরেনি বা চুমোও খায়নি। কিন্তু চূড়ায় ওঠার পর গুহায় ঢুকে তরুণীদের আদরে আদরে অস্থির করে তুলছে তরুণরা।

'ক্যালেমেগডান প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলনমেলা,' বলল নোভা। 'আমি তোমাকে ভালবাসি, এই কথাটা বলার জন্যেই এখানে আসে ওরা। দূরে তাকান, দেখুন হালকা কুয়াশার ভেতরও দানিয়ুব আর সাভাকে দেখা যাচ্ছে–পরস্পরের সঙ্গে যেখানে মিশেছে সেখানে কি আলোড়ন আর উচ্ছ্বাস!'

চারপাশে, আড়ালে-আবডালে, অসংখ্য যুগলবন্দী মানুষ, কিন্তু পরিবেশটা শান্ত ও নিস্তব্ধ–বলা যায় পবিত্র।

'এখানে সাধারণত কেউ একা আসে না,' আবার বলল নোভা। 'প্রায় সবার সঙ্গেই থাকে তার মনের মানুষ।'

'আপনি তো আগেও এসেছেন, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই কেউ ছিল···কে সে?'

'বেলগ্রেডে আমি বন্দিনী, রানা,' বলল নোভা। 'দেহরক্ষীদের উপস্থিতিতে প্রেম করার সুযোগ কোথায়? যতবার এসেছি, আমার সঙ্গে সিলভিয়া ছিল। আজ আপনাকে দেখে কি যে হলো আমার, কোত্থেকে যেন বিদ্রোহ করার সাহস আর শক্তি পেয়ে গেলাম। একা এই প্রথম আমাকে ছাড়ল ওরা···'

'কেন, আপনাকে এভাবে পাহারা দিয়ে রাখার কারণ কি?'

'ওরা চায় না আমার কোন বিপদ হোক,' বলল নোভা। 'সিডাক আঙ্কেল আর সিলভিয়ার কথা বলছি।'

'যদি অনধিকার চর্চা না হয়, জানতে পারি, ঠিক কি ধরনের বিপদ আশঙ্কা করা হচ্ছে?'

'আমাদের পারিবারিক এক শত্রু আছে,' ম্লান সুরে বলল নোভা। 'সুযোগ পেলে সে আমাকে কিডন্যাপ করতে পারে। অন্তত সবাই তাই বলে আর কি। তবে থাক, এ-প্রসঙ্গ থাক। আপনি নিজের সম্পর্কে বলুন। জানেন, আমার সত্যি খুব কৌতূহল হচ্ছে।'

'এভাবে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কোথাও বসা যায় না?'

হাত নেড়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল নোভা। 'এখন আর কিছু করার নেই, রানা, আমরা দেরি করে ফেলায় সব গুহাই দখল হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, এমন কি বোল্ডারের আড়ালগুলোও।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দু'জনেই ওরা হেসে উঠল। তারপর, আবার রানার হাত ধরে টান দিল নোভা, বলল, 'আসুন, ওদিকে একটা রেস্তোরাঁ আছে।'

ঢাল বেয়ে খানিকটা নেমে এল ওরা, তারপর একটা গুহাতেই ঢুকল। পাথুরে দেয়াল ঘষে মসৃণ করা হয়েছে, নিচু ছাদ ফলস সিলিঙে ঢাকা। পাঁচ-ছ'টা টেবিল, বিশ-পঁচিশটা চেয়ার। এক কোণে ছোট্ট একটা বার। গুহাটা বেশ বড়, ফাঁকা জায়গায় জোড়ায় জোড়ায় নাচছে ছেলেমেয়েরা। কাউন্টারের পাশে একটা অটোমেটিক গ্রামোফোন বা জুকবক্স, আমেরিকান জ্যায বাজছে।

এক ধারের একটা টেবিল দখল করল ওরা, জানালা দিয়ে সাভা নদীর ওপর নৌকা দেখা যাচ্ছে। ওয়েটারের সঙ্গে নোভাই কথা বলল। একটা প্লেটে খোসা ছাড়ানো বাদাম আর দু'কাপ কফি দিয়ে গেল সে।

সঙ্গীত বা নাচ, কোনটাই সহ্য করার মত নয়। পুরনো, ঘষা রেকর্ড থেকে

জ্যায নয়, যেন আহত পশুর মরণ আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে। আর নাচের বদলে চলছে পরস্পরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। ওয়েটারকে ডেকে জুকবক্সটা বন্ধ করতে বলল নোভা।

জুকবক্স থামতে রেস্তোরাঁ প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। মুখোমুখি বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল ওরা। বিকেল শেষ হতে চলল, গোধূলির ম্লানিমা বিশ্বচরাচরে গভীর বিষাদের ছায়া ফেলছে। রানা ভাবছে, দুনিয়ার বুকে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে। পরস্পরকে ওরা চেনে না, মাত্র পরিচয় হয়েছে, অথচ দু'জনেই ব্যাকুল হয়ে চাইছে নিজেকে মেলে ধরতে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। অলঙ্ঘনীয় কোন নিষেধ চুপ করে থাকতে বাধ্য করছে নোভাকে। আর কর্তব্যের খাতিরে মুখ খুলতে পারছে না রানা।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে ওরা দেখল ভারী মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে চাঁদ। ঢাল বেয়ে নামার সময় খেয়াল করল রানা, গোটা এলাকা ইতিমধ্যে প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। এঁকেবেঁকে নেমে গেছে পাহাড়ী পথ, খুব বেশি খাড়া অংশে ধাপ তৈরি করা আছে। এরকম এক প্রস্থ সিঁড়ির মাথা থেকে নিচে নামতেই কালো লেদার জ্যাকেটকে দেখতে পেল ও। সরাসরি বা স্পষ্ট নয়, আবছা ছায়ার মত। এক সেকেন্ড পর আরও একটা ছায়া দেখতে পেল–সেই লম্বা তালগাছ, জর্জিক জোড়া। এখনও দূরে ওরা, তবে এদিকেই আসছে।

প্রথমেই নোভার কথা ভাবল রানা।

সিঁড়ির নিচে দু'ভাগ হয়ে গেছে পথ। ডান দিকে মসজিদের উঁচু মিনার দেখা যাচ্ছে, বাম দিকে চার্চের আকাশ ছোঁয়া টাওয়ার। তালগাছ আর লেদার জ্যাকেট ডান দিক থেকে আসছে। বাম দিকের পথটা খাদ আর ড্রব্রিজ-এর দিকে চলে গেছে, দূরে দেখা যাচ্ছে দুর্গ-প্রাকার। নোভার কনুই খামচে ধরে ড্রব্রিজ-এর দিকে ছুটল রানা, হিসহিস করে বলল, 'দৌড়ান! ভাব দেখান আমাকে আপনি চেনেন না! যান, পালান!'

দৌড়াবে কি, নোভার পায়ে যেন শিকড় গজাল। 'কেন পালাব?' জোড়া ছায়ামূর্তি সে-ও দেখতে পেয়েছে। 'ওরা কি আমাকে ধরার জন্যে আসছে?'

'না। আমাকে।'

'কিভাবে বুঝলেন?'

'এটা তর্ক করার সময় নয়। দৌড়ান!' নোভার পিঠে ধাক্কা দিল রানা। কিন্তু নড়ল না সে।

ইতিমধ্যে অবশ্য দেরি হয়ে গেছে। পিছু হটে সিঁড়ির মাথায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ পঁচিশটা ধাপ টপকাবার আগেই ওদেরকে ধরে ফেলবে লোক দুজন। ওদিকে ডানদিকের পথ ছেড়ে ঢাল বেয়ে বাম দিকের পথে উঠে এসেছে তালগাছ। নোভাকে নিয়ে কয়েক পা এগোল রানা, চার্চের পাশে এসে ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ফেলে আসা রেস্তোরাঁ থেকে আবার সেই আহত পশুর আর্তনাদ ভেসে আসছে। এবার তার সঙ্গে যোগ হয়েছে গিটার আর ছন্দবদ্ধ হাততালির আওয়াজ। ছায়া দুটো অলস ভঙ্গিতে দু'দিকের পথ ধরে এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের জন্যে মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ, সাদাটে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে

উঠল অনুসরণকারীদের মুখ। লেদার জ্যাকেট গোলগাল আকৃতির, মুখটা ভরাট। তালগাছের সরু মুখটা দু'ভাগ করে রেখেছে পুরু গোঁফ। আজ সকালে এই লোককেই পুলিস হেডকোয়ার্টারের কাঁচমোড়া সেন্ট্রিবক্সে দেখেছিল রানা, কোন সন্দেহ নেই।

ছায়া দুটো ওদের কাছ থেকে বারো ফুট দূরে এখন, অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। প্রফেশনাল, তাই তাড়াহুড়ো করছে না। চাঁদটা আবার মেঘের আড়ালে লুকিয়েছে, রানা জানে গাঢ় ছায়ার ভেতর ওকে তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই, তবে সেটা বুঝতে দিতে চায় না ও। জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরার সময় একটু বেশি নড়াচড়া করল, শত্রুরা যাতে দেখতে পায় ওকে। বড়সড় ওয়ালেটটা বের করে আনল পকেট থেকে, সেই সঙ্গে জুতোর গোড়ালি দিয়ে বাড়ি মারল চার্চের পাথুরে দেয়ালে। দূর থেকে কালো লেদার কেসটাকে আগ্নেয়াস্ত্র বলে মনে হতে পারে, আর পাথরে লাথির আওয়াজটাকে মনে হতে পারে সেফটি ক্যাচ অফ করার শব্দ। ডান হাতের তালুতে ওয়ালেটটা এমনভাবে ধরল রানা, যেন ওটা একটা পিস্তল।

থমকে দাঁড়াল দুই শত্রু, তবে মুহূর্তের জন্যে মাত্র। রিভলভারটা যেন জর্জিক জোডার বাহুর বর্ধিত অংশ, এইমাত্র গর্জিয়েছে। লেদার জ্যাকেট চকলেট রঙের ব্রিফকেস খুলতে ব্যস্ত। ঠিক এই সময় রানার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। লেদার জ্যাকেটের মুখে ভারী ওয়ালেটটা ধাঁ করে বসিয়ে দিল, খসে পড়তে দেখে ছোঁ দিয়ে ধরে ফেলল ব্রিফকেস, কোন বিরতি ছাড়াই দেহভঙ্গি বদলে ছুঁড়ে দিল সেটা তালগাছের মুখ লক্ষ্য করে। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করল জর্জিক, ব্রিফকেসটা তার নাকে লেগেছে। তাল হারিয়ে ফেলল সে, এই সুযোগে তার অরক্ষিত গর্দানে হাতের কিনারা দিয়ে প্রচণ্ড এক কোপ মারল রানা।

খক্-খক্ করে কাশছে জর্জিক, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে, তারপরও চেষ্টা করছে হাতের অস্ত্র রানার দিকে তুলতে। লাথি চালাল রানা, জুতোটা লাগল লোকটার কব্জিতে। পাথুরে জমিতে পড়ে খটাখট আওয়াজ তুলল রিভলভার। রানা ঘুরে দাঁড়াবে, কিন্তু তার আগেই ওর পিঠে চড়াও হলো লেদার জ্যাকেট, হাতের ভাঁজে ওর গলাটা আটকে ফেলেছে, অপর হাতে চুল টানছে। রানার মনে হলো, চুল সহ খুলিটা মাথা থেকে খসিয়ে আনতে চেষ্টা করছে ব্যাটা। বিস্ফারিত চোখে দেখল রিভলবারটার খোঁজে অন্ধকার পথটা হাতড়াচ্ছে জর্জিক।

রিভলবার পেয়ে গেল সে। সিধে হতে যাচ্ছে, তীক্ষ্ণকণ্ঠে 'ইউ বাস্টার্ড' বলে রানাকে পাশ কাটাল নোভা। লাথি মারল সে, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল জর্জিক। রানা পিছন দিকে কনুই চালাতে প্রায় একই সঙ্গে লেদার জ্যাকেটও 'কোঁক' করে উঠল, তার পাঁজরের একটা হাড় নির্ঘাত ভেঙে গেছে।

হাড় ভাঙলেও, রানার গলাটা সে ছাড়ল না। লোকটার পায়ে ডান পায়ের জুতোটা ঠুকল রানা, যেন হাতুড়ি মারছে। গলা থেকে হাতটা সরে গেল এবার। ঘুরেই লোকটার তলপেটে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল ও। ছিটকে পড়ে গেল লেদার জ্যাকেট।

রিভলবারটা ধরার জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে তালগাছ, তাকে পাশ

কাটিয়ে সেটায় লাথি মারল নোভা, সাহায্যের আশায় চিৎকার করছে। পথের কিনারা থেকে খাদে নেমে গেল অস্ত্রটা। একলাফে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে নোভার চিবুকে ঘুসি মারল লোকটা। হোঁচট খেতে খেতে পিছিয়ে এল নোভা, তাকে ধরার জন্যে সামনে হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে সে। ধাক্কা দিয়ে নোভার পতনটা দ্রুত করল রানা, তারপর একলাফে তালগাছের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রাণপণ শক্তিতে ডানহাতের কিনারা দিয়ে ব্যাকস্ট্রোকের প্রচণ্ড এক কোপ মারল ও লোকটার কানের নিচে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, দু'হাত দিয়ে গলার পাশটা চেপে ধরেছে জর্জিক। লম্বা চুল এক হাতের মুঠোয় ধরল রানা, অপর হাতের উভয় পিঠ দিয়ে ঠাস ঠাস করে চড় মারছে—শব্দগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছে আলভিক নুরানিক আর মধ্যবয়স্কা চেম্বারমেইডের কথা।

চিৎকারটা শুনে চমকে উঠল রানা। নোভা বিপদে পড়েছে মনে করে তালগাছকে ছেড়ে ঘুরল ও। ভেবেছিল লেদার জ্যাকেট আবার হামলা করেছে বুঝি, কিন্তু লেজ তুলে তাকে পালাতে দেখল ও। ধাপ বেয়ে তরতর করে নেমে আসছে কয়েকজন তরুণ, তাদের সঙ্গে একজন সৈনিকও আছে। নোভাকে তারা চেনে, তার চিৎকার শুনে রেস্তোরাঁ থেকে ছুটে আসছে। ইতিমধ্যে ঢাল বেয়ে নিচে নেমে গেছে লেদার জ্যাকেট, শহরের আলো-আঁধারির ভেতর হারিয়ে গেল সে। নোভাকে ঘিরে দাঁড়াল তরুণরা। রানা তাদের দিকে পিছন ফিরল।

ইতিমধ্যে সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছে জর্জিক জোড়া। এক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। 'পরের বার তোমাকে আমি খুন করব, মাসুদ রানা! পারলে ঠেকিয়ো!' হিসহিস করে বলল লোকটা। দ্রুতপায়ে নামছে সিঁড়ি বেয়ে।

'সে সুযোগ তুমি পাবে না!' বলেই তাকে ধরার জন্যে এগোল রানা। কিন্তু উত্তর শোনার জন্যে অপেক্ষা করেনি লোকটা, অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে এরইমধ্যে। কয়েক পা এগিয়ে কোথাও তাকে দেখতে পেল না ও। পিছন থেকে কাতর কণ্ঠে ওকে ডাকছে নোভা। 'রানা! রানা!' ওয়ালেটটা দেখতে পেয়ে তুলে নিল রানা, তারপর ঘুরে নোভার দিকে এগোল।

তরুণরা ওদেরকে খানিকটা এগিয়ে দিচ্ছে। একজন বলল, 'নিশ্চয়ই ওরা গুণ্ডা! আপনার বান্ধবীকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিল।'

ড্রব্রিজে পৌঁছে তরুণদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় করে দিল নোভা। ব্রিজের ওপর এই মুহূর্তে ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। 'এভাবে আমার সঙ্গে বেরুনো আপনার উচিত হয়নি,' নোভাকে বলল রানা। 'অন্তত সঙ্গে একটা অস্ত্র থাকা উচিত ছিল।'

'ওটা কি দেখুন তো, ওতে সম্ভবত অস্ত্র আছে,' বলে হাত তুলে কিছু একটা দেখাল নোভা।

ব্রিজের ওপর হাঁটু গাড়ল রানা। ব্রিফকেসটা দেখেই চিনতে পারল। লেদার জ্যাকেটের হাতে ছিল। কিন্তু খুলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, কোথাও আটকাচ্ছে। আছাড় দিতে গিয়েও মত পাল্টাল। ফলে প্রাণ বাঁচল ওর কিংবা ওদের। ব্রিফকেসের ওপর আদর করে হাত চাপড়াল রানা, ওটা যেন একটা কুকুর। নোভাকে পাশে নিয়ে আবার হাঁটছে ও, হাতে ব্রিফকেস।

বারজাকলি মসজিদের কাছে এসে ট্যাক্সি পেল ওরা। মোয়াজ্জিনের ঝুল-বারান্দায় আলো নেই। মিনারের চূড়ার পাশে আধখানা চাঁদ। পথে কোন কথা হলো না।

সিটি শেরাটনের সামনে ড্রাইভারকে থামতে বলল রানা। ভাড়া মিটিয়ে নামতে যাবে, ওর হাত ধরে নোভা ফিসফিস করে বলল, 'না, প্লীজ, আপনি যাবেন না!'

ফ্ল্যাটবাড়ির গেটেই খবর পেল ওরা; নোভার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সিলভিয়া চলে গেছে। রানাকে নিয়ে সরাসরি নিজের বেডরূমে চলে এল নোভা। তার তাগাদায় সংলগ্ন বাথরূমে ঢুকে গরম পানি দিয়ে মুখ-হাত ধুলো রানা। ফিরে এসে দেখল, ইতিমধ্যে কাপড় পাল্টেছে নোভা, ওর জন্যে ধূমায়িত কফি নিয়ে অপেক্ষা করছে।

বিছানায় পাশাপাশি বসল ওরা। একটু নাটকীয় ও আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতেই নোভা বলল, 'আপনি সত্যি আমাকে মস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, রানা; সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না,' বিনয়ের অবতার সাজল রানা। 'বিপদে পড়া অপূর্ব সুন্দরী মেয়েদের সাহায্য করা আমার একটা বদভ্যাস।'

'তাই?' নোভা হাসছে না। 'ওরা কারা বলুন তো? ঠিক কি চাইছিল?'

'জানি না। সম্ভবত ড. সিডাকের লোক। অন্তত সিক্রেট পুলিস তো বটেই।'

মাথা নাড়ল নোভা। 'না। ওরা সিডাক আঙ্কেলের লোক নয়।'

'কি করে বুঝলেন? ওরা আপনাকেও খুন করতে চাইছিল, তাই দেখে?'

'আপনার এ-কথার মানে?' ভুরু কোঁচকাল নোভা।

'অস্বীকার করে লাভ নেই, নোভা—আপনি নিজেও ড. সিডাকের হয়ে কাজ করছেন। তিনি বিশ্বাস করে আমাকে আপনার হাতে তুলেও দিয়েছেন। আপনার কাজ আমাকে নজরে রাখা, তাই না?'

'আপনি আমাকে অপমান করছেন, রানা। তবে আমি গায়ে মাখছি না। আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। ওরা দু'জন আর আমি যদি সিডাক আঙ্কেলের লোক হই, ওরা তাহলে আমার গায়ে হাত তুলবে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ব্যাপারটা অভিনয়ও হতে পারে। ধাপ্পা। আপনার ওপর আমার বিশ্বাস জাগাবার কৌশল। কিংবা ওরা হয়তো এমন কি এ-ও চেয়েছিল···' থেমে গেল ও।

'কিংবা ওরা হয়তো আমার সর্বনাশ করতে চেয়েছিল···?'

'শুনুন, ওরা আমাদের কাউকে খুন করতে চেয়েছে, এ আমি বিশ্বাস করি না,' বলল রানা। 'অন্তত আজ সন্ধ্যায় সে ইচ্ছা নিয়ে ওরা আসেনি। তবে এক পর্যায়ে পরিস্থিতি ওদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছিল। আজ সকালেও ওরা আমার সামনে একটা মেয়েকে খুন করেছে। তখনও ইচ্ছে করলে আমাকে ওরা মেরে ফেলতে পারত, কিন্তু মারেনি। ক্যালেমেগডানেও ঠিক তাই ঘটেছে। ওরা লুকিয়ে থেকে গুলি করলে আমাদের কিছু করার ছিল? কিন্তু তা ওরা করেনি।'

'তাহলে কি চাইছে ওরা?'

'ভয় দেখাতে।'

'কেন?'

'কেন আপনি তা ভাল করেই জানেন,' বলল রানা। 'পুলিশের ধারণা, সাঈদ মুর্তজায়েভের কাছে টপ সিক্রেট একটা ডকুমেন্ট আছে, আমি এসেছি যুগোস্লাভিয়া থেকে সেটা পাচার করে নিয়ে যেতে। ওরা ভয় দেখাচ্ছে, আমি যাতে পালাবার চেষ্টা না করে ডকুমেন্টটা পেয়ে ওদের হাতে তুলে দিই।'

বিছানা ছেড়ে বেডরুমের আরেক প্রান্তে চলে গেল নোভা, ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে ডায়াল করল দ্রুত। 'আঙ্কেল' শব্দটা রানার কানে ঢুকল। তিন-চার মিনিট কথা বলল নোভা, তারপর ফোন রেখে দিয়ে ফিরে এল রানার কাছে। 'ক্যালেমেগডানে কি ঘটেছে বললাম সিডাক আঙ্কেলকে। উনি বলছেন, ওরা তাঁর লোক নয়।'

রানা কিছু বলল না।

'কাল দুপুর দুটোয় সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট,' আবার বলল নোভা। 'সিডাক আঙ্কেল বলছেন, কোন লিখিত অনুমতির দরকার নেই। গার্ডদের বলা থাকবে, আপনাকে তারা ভেতরে ঢুকতে বাধা দেবে না। আপনি যে যাচ্ছেন, সাঈদ মুর্তজায়েভকে আগেই তা জানিয়ে দেয়া হবে।' থেমে দম নিল সে। 'উনি হয়তো আপনাকে একটা পাণ্ডুলিপি দেবেন, রানা।'

কথা না বলে অপেক্ষা করছে রানা। আশা করছে নোভা আরও কিছু বলবে।

'কি লেখা হয়েছে তা না জেনে আমরা চাই না তাঁর ওই পাণ্ডুলিপি ছাপা হোক।'

'আমরা মানে আপনি আর ড. সিডাক?'

'আমরা মানে যুগোস্লাভিয়া সরকার।'

'উনি কি শুধুই একটা পাণ্ডুলিপি দেবেন আমাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'টপ সিক্রেট কোন ডকুমেন্ট নয়?'

'উনি যা-ই দিন, আমাকে আপনি তা দেখতে দেবেন,' বলল নোভা।

'এতক্ষণে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন,' বলল রানা, ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপ।

আহত দেখাল নোভাকে। 'এটা আমার কর্তব্য, রানা,' ম্লান সুরে বলল সে। 'আমি চাই না কেউ আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাবুক।'

'ডকুমেন্টটায় কি আছে তুমি জানো?' অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞেস করল রানা। একটা হাত রাখল নোভার পিঠে।

'না।'

'ধরো, ওটা মারাত্মক এক ষড়যন্ত্রের নীল-নক্সা, গুরুতর কোন অপরাধের পরিকল্পনা। দেখার পর কি করবে তুমি?'

'আমাকে তুমি পরীক্ষা করছ,' নোভার কণ্ঠে অভিমান।

'কি করবে, নোভা? চেপে যাবে? একটা ভয়ঙ্কর ক্রাইম হতে যাচ্ছে জেনেও ওটা ফিরিয়ে দেবে সবকারকে?'

'জিজ্ঞেস করছ আমি কি করব। তার আগে বলো, তুমি কি করবে?'

'আমি দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেব,' বলল রানা। 'তোমার কাছে স্বীকার করতে আপত্তি নেই, ঠিক সেজন্যেই যুগোস্লাভিয়ায় এসেছি আমি।'

'এখানেই আমার আপত্তি, রানা,' বলল নোভা। ঝুঁকে হাত বাড়াল সে, রানার গালে আঙুল বোলাল। আঙুলগুলো কাঁপছে। 'আমি জানি ওটা নিয়ে যুগোস্লাভিয়া ত্যাগ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। ওরা তোমাকে খুন করে ফেলবে।'

'ভুলে যেয়ো না, ঝুঁকি আছে জেনেও এসেছি আমি। পারব কিনা জানি না, তবে আমাকে চেষ্টা করতে হবে। তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো, আমার সফল হবার সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে যাবে, নোভা।'

চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, নোভা আরও কাছে সরে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানাকে। 'বাবাকে ওরা খুন করেছে, রানা। আমি চাই না তুমিও...'

নোভার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'আমার ওপর আস্থা রাখো, লক্ষ্মী মেয়ে। আমি জানি, আমাকে অনেক কথা বলার আছে তোমার। কারা তোমার বাবাকে খুন করেছে, কারা তোমাকে কিডন্যাপ করতে চায়, আমার ব্যাপারে ঠিক কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে তোমাকে। কিন্তু আজ অনেক রাত হয়ে গেছে, আমাকে হোটেলে ফিরতে হবে। পরে এক সময় সব শুনব। ইতিমধ্যে মনস্থির করো, তোমার সাহায্য সত্যি আমার দরকার।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল নোভা। ফিরে এল একহাতে তোয়ালে, অপরহাতে একটা পিস্তল নিয়ে। পিস্তলটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এটা রাখো। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে আমি তোমাকে দিয়েছি।'

'আমার ধারণা এই ব্রিফকেসে অস্ত্র আছে,' ইঙ্গিতে পায়ের কাছে পড়ে থাকা ব্রিফকেসটা দেখাল রানা। 'একটা হাতুড়ি পাও কিনা দেখো, খুলে দেখি।'

হাতুড়ির কয়েকটা বাড়ি মারতেই ব্রিফকেসের তালা খুলে গেল। ঢাকনি তুলে ভেতরে তাকিয়েই আঁতকে উঠল নোভা। 'ওহ্, গড!'

ভেতরে তিনটে পিস্তল দেখা যাচ্ছে–একটা বেরেটা, একটা ল্যুগার আর একটা ওয়েবলি-ভিকারস্। প্রতিটি অস্ত্রের জন্যে দুই বাক্স করে অতিরিক্ত অ্যামিউনিশন। ফোমের ওপর শুয়ে রয়েছে একজোড়া আমেরিকান পাইনঅ্যাপল-টাইপ হ্যান্ড গ্রেনেড। এক পাশে পাওয়া গেল ছ'টা ফ্লেয়ার। আরেক পাশে ডিটোনেটর ও টাইমার সহ আধ কেজি জেলিগনাইট, বড় আকারের দু'তিনটে বিল্ডিং উড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

'এগুলো কাজে লাগতে পারে,' বলে কামরার চারদিকে তাকাল রানা। 'ব্রিফকেসটা যদি তোমার ওয়ার্ড্রোবের পিছনের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিই, অ্যাক্সিডেন্টালি কারও দেখে ফেলার ভয় আছে?'

রানার দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল নোভা, তারপর মাথা নাড়ল। 'আমার এই ঘরে কেউ ঢোকে না। কিন্তু এত সব মারাত্মক গোলাবারুদ কি কাজে লাগবে তোমার?'

'এখুনি বলতে পারছি না। শুধু কথা দিতে পারি ব্যক্তিস্বার্থে বা অসৎ কোনও কাজে ব্যবহার করা হবে না। ধরো, তুমি এখানে নেই, আমি ব্রিফকেসটা নিতে

এলাম–আমাকে দেবে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নোভা বলল, 'দেবে, চাচিকে আমি বলে রাখব।'

'ধন্যবাদ। এবার আমার জন্যে টেলিফোনে একটা ট্যাক্সি ডাকো।' ব্রিফকেস থেকে ল্যুগারটা বের করে নিজের বেল্টে গুঁজছে রানা।

'ওরা সার্চ করলে কি জবাব দেবে?' জিজ্ঞেস করল নোভা। 'তারচেয়ে আমার ওয়ালথারটা রাখো তুমি। ল্যুগারটা ব্রিফকেসেই থাক।'

নোভার কথায় যুক্তি আছে। ল্যুগারটা ব্রিফকেসে রেখে দিয়ে তার হাত থেকে ওয়ালথার নিল রানা। নোভা ওকে কিছু অতিরিক্ত অ্যামিউনিশনও এনে দিল।

ওকে ট্যাক্সিতে তুলে দেয়ার জন্যে নিচে নামল নোভা। ট্যাক্সি ছাড়ার আগে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে তুমি আমার সঙ্গে ডিনার খাবে?'

ইতস্তত করছে নোভা। তারপর ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল।

পাঁচ

রাত দশটায় হোটেলে ফিরল রানা। লাউঞ্জে থেমে ডেস্ক থেকে চাবি নেয়ার সময় অর্ডার দিল ওর ডিনার যেন স্যুইটে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে করিডর ধরে নিজের স্যুইটের দিকে এগোচ্ছে, উল্টোদিকের অ্যালকোভ স্যালনে এক লোককে দেখতে পেল। লাল লাউঞ্জ চেয়ারে বসে আছে, শার্টের কলার দিয়ে ঘাড় আর হ্যাট দিয়ে মুখ ঢাকা, সম্ভবত ঘুমাচ্ছে। ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে ওয়ালথারের সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা, অপর হাতে স্যুইটের তালা খুলছে।

'মি. রানা!' ভোঁতা একটা গলা ভেসে এল।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, পকেটের ভেতর পিস্তলটা শক্ত করে ধরে আছে। লাল লাউঞ্জ চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো লোকটা। চিনতে পারায় ঢিল পড়ল রানার পেশিতে। দরজা খুলল ও, বিলিয়ার্ডকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

সিটিংরুমের আলো জ্বালতেই ধাক্কা খেলো ওরা। দম আটকে ফিসফিস করলেন বিলিয়ার্ড, 'মাই গড!'

কামরার ভেতর যেন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। সোফা সেট উল্টে ফেলা হয়েছে, মেঝের অর্ধেক কার্পেট গুটানো, ক্লজিট খুলে সমস্ত জিনিস-পত্র ছড়ানো হয়েছে মেঝেতে। ঠিক একই অবস্থা বেডরুমেরও। ওয়ার্ড্রোবের দরজা হাঁ-হাঁ করছে, হ্যাঙ্গার সহ সমস্ত কাপড়চোপড় বিছানায় পড়ে আছে, প্রতিটি বালিশ ছুরি দিয়ে চেরা। এমন কি বাথরুমের মেডিসিন কেবিনেটও তছনছ করা হয়েছে। শেভিং ক্রীম দিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকা হয়েছে আয়নায়। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো খুলে বেডরুম থেকে ঝুল-বারান্দায় বেরুলেন বিলিয়ার্ড, একটু পরই হাতে একটা ভারি লোহার বার নিয়ে ফিরে এলেন। বার-এর মাথাটা বাঁকা, বর্শার মত ছুঁচালো। জিনিসটা দেখতে ঠিক যেন একটা লংশোরম্যান-এর লোডিং হুক। 'কোন সন্দেহ নেই, আপনাকে ওরা খুন করতেই এসেছিল,' বলে হাতের বারটা রানাকে দেখালেন

বিলিয়ার্ড।

'ওরা যে কারণেই এসে থাকুক, আপনি কেন এসেছেন তাই বলুন,' বিলিয়ার্ডের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। 'এত রাতে নিশ্চয়ই গল্প করতে নয়?'

বিলিয়ার্ডকে আহত দেখাল। 'আমার সঙ্গে আসুন, হুকটা কোথায় পেয়েছি দেখাই।' তার পিছু নিয়ে অন্ধকার ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। 'শুনুন, ঘরের ভেতর কথা বলা নিরাপদ নয়, ওরা হয়তো আড়িপাতা যন্ত্র রেখে গেছে। আমি এসেছি অফিশিয়াল একটা সিদ্ধান্তের কথা আপনাকে জানাতে। আজ বিকেলে দূতাবাসে একটা মীটিং হয়েছে। স্টাফকে জেমস ফোলি নির্দেশ দিয়েছে, সাঈদ মুর্তজায়েভের লেখা কোন পাণ্ডুলিপি আপনার কাছ থেকে বা অন্য কারও কাছ থেকে যে-ই পাক, পাওয়া মাত্র তার হাতে তুলে দিতে হবে। সে প্রকাশ্যেই বলছে, যুগোস্লাভিয়ায় যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রতিনিধি নেই, তাদের স্বার্থ তাকেই দেখতে হবে। তার ধারণা, সাঈদ মুর্তজায়েভ যে বইটা লিখেছেন তাতে আমেরিকার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হয়েছে, কাজেই তাকে চেষ্টা করতে হবে সেটা যাতে ছাপার মুখ না দেখে।'

'তার স্পর্ধা আমাকে অবাক করছে।'

'আমাকে সে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়ে দিয়েছে, পাণ্ডুলিপিটা পাচার করার জন্যে আমি যেন আপনাকে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ ব্যবহারের সুযোগ না দিই। আপনাকে বলতে বলেছে, পাণ্ডুলিপিটা পেলে আমার মাধ্যমে তার হাতে তুলে দিতে হবে।'

'সে একা নয়, এই একই প্রস্তাব আরও একজন দিয়েছে আমাকে।'

'লিলিয়ান নোভা?'

'হ্যাঁ।'

'আমি অবাক হচ্ছি না,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'আপনি যে কাল সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা করছেন, ফোলি তা জানে। সে চায়, ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে বেরিয়েই পাণ্ডুলিপিটা আপনি তার হাতে তুলে দেবেন।'

'আবদার, না?'

'মি. রানা, ভাল করে ভেবে দেখুন। পাণ্ডুলিপি বা ডকুমেন্ট, ডিপ্লোম্যাটিক পাউচ ছাড়া কিভাবে ওগুলো আপনি পাচার করবেন?'

রানা উত্তর দেয়ার আগেই নক হলো দরজায়। পরিচয় জেনে নিয়ে দরজা খুলল রানা। ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকে হতভম্ব হয়ে গেল ওয়েটার। একটা টেবিল ও দুটো চেয়ার খাড়া করল সে, টেবিলে দক্ষ হাতে ডিনার সাজাল। বিলিয়ার্ডকে সাধল রানা, তিনি মাথা নাড়তে একাই খেতে বসল। খিদে নষ্ট হয়ে গেছে, সামান্য কিছু মুখে দিয়ে দুটো কাপে কফি ঢালল ও। ইতিমধ্যে ক্যালেমেগডানে কি ঘটেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিল বিলিয়ার্ডকে। ফ্ল্যাটে ফিরে নোভা ড. সিডাককে ফোন করেছিল, এ-কথাও জানাল। তারপর ব্রোঞ্জ মূর্তিটার কথা বলল, তারপর জানতে চাইল, নোভার বাবাকে কারা খুন করেছিল।

'হ্যাঁ, ওটা নিকোলাই সুনজাকের মূর্তি,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'সুনজাককে খুন করেছে কার্চিক জোডা, ওই লম্বা লোকটার যমজ ভাই।'

'কার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক, আমাকে বলবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে জটিল একটা ধাঁধার মত লাগছে।'

খালি চেয়ারটায় বসলেন বিলিয়ার্ড। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে শুরু করলেন তিনি।

সাঈদ মুর্তজায়েভ, ড. দেবারভিল সিডাক, নিকোলাই সুনজাক আর ম্যাক বিলিয়ার্ড কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মুর্তজায়েভ, সিডাক ও সুনজাকের জন্ম মন্ট্রিনিগ্রোয়, পরস্পরের প্রতিবেশী ছিলেন ওঁরা। ম্যাক বিলিয়ার্ডের বাবা ইংরেজ, মা ক্রোট; জন্ম বেলগ্রেডেই।

সাঈদ মুর্তজায়েভ ধনী মুসলমান, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তিনিই তাঁর বাল্যবন্ধু নিকোলাই সুনজাককে পার্টিতে নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন খ্রিস্টান। সুনজাকের দেখাদেখি কার্চিক জোডাও পার্টিতে নাম লেখায়। ও আমাদের চেয়ে বয়সে বেশ অনেক ছোট, বসনিয়া থেকে বেলগ্রেডে আসে।

পার্টিতে নাম লেখাবার আগেই কবি ও দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন মুর্তজায়েভ। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার জন্যে তাঁর একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার ছিল, কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়ার সেটাই কারণ। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর মোহভঙ্গ ঘটে। পার্টিতে রাশিয়ার প্রভাব খুব বেশি, এবং রাশিয়া সার্ব ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিকে দাবিয়ে রাখার জন্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব গ্রহণে ক্যাডারদের উৎসাহ যোগাচ্ছে। এই নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। মূল পার্টি থেকে আলাদা হয়ে গেলেন মুর্তজায়েভ, সরে গেলেন দুর্বল একটা অংশে। তাঁর প্রিয় ও ঘনিষ্ঠতম বন্ধু নিকোলাই সুনজাক মনে-প্রাণে অসাম্প্রদায়িক হলেও, মূল পার্টিতেই থেকে গেলেন।

কার্চিক জোডার ভূমিকা খুব রহস্যময় ছিল। বিচ্ছিন্ন পার্টিকে এক করার কাজে উঠেপড়ে লাগে সে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল জন্মভূমি বসনিয়ায় গিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, অর্থাৎ মুসলমান নিধনে, অংশগ্রহণ করে সে। ব্যাপারটা একরকম ওপেন সিক্রেটই ছিল, রাশিয়া তাকে কিলিং মেশিনে পরিণত করেছিল, এখনও সে তাই আছে।

লেখালেখির জন্যে রাজনীতি থেকে কিছু দিন দূরে সরে থাকেন মুর্তজায়েভ। রাজনীতি, কবিতা ও দর্শনের কয়েকটা বই প্রকাশ করেন তিনি, সেগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ হলে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান। এই সময় খবর আসে, তাঁর দলের কর্মীরা গুপ্তহত্যার শিকার হচ্ছে। কর্মীদের নিয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যান তিনি। ওই পাহাড়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন নিকোলাই সুনজাক, সাথে কার্চিক জোডা। এখানে তাঁর প্রিয় বাল্যবন্ধু নিকোলাই সুনজাক খুন হন। মূল পার্টি ও কার্চিক জোডা রটিয়ে দেয়, সুনজাককে মুর্তজায়েভই খুন করেছেন। সবাই তা বিশ্বাসও করে। গ্রেফতার হবার পর তাঁর বিচার শুরু হয়। বহু বছর চলে সে বিচার। জেলে বসে আরও অনেক বই লেখেন তিনি, আরও বৃদ্ধি পায় জনপ্রিয়তা।

বেলগ্রেডের কিছু বুদ্ধিজীবী মুর্তজায়েভের অজ্ঞাতে সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসেন—মুর্তজায়েভ পার্টি ত্যাগ করবেন, সরকার তাঁর বিরুদ্ধে খুনের

অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেবে। জেলখানা থেকে জামিনে বেরিয়ে এলে বুদ্ধিজীবী বন্ধুরা তাঁকে পার্টি ত্যাগ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াতে বলেন। ইতিমধ্যে পার্টি ও কমিউনিজম, দুটোর প্রতিই বিতৃষ্ণা জন্মেছে মুর্তজায়েভের, বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ মেনে নিয়ে ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হন, এবং খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা থাকায় নির্বাচনে জিতেও যান। বিজয়ী হওয়ায় তাঁকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়, সেই অনুষ্ঠানে নিকোলাই সুনজাকের কন্যা লিলিয়ান নোভা স্টেজে উঠে প্রকাশ্যে তাঁকে চড় মারে। সবার মত নোভারও ধারণা, তার বাবা সুনজাককে মুর্তজায়েভই খুন করেছেন। কিন্তু নোভা জানে না ওর বাবার বাল্যবন্ধু এই মুর্তজায়েভই ওর বেলগ্রেড ইউনির্ভাসিটিতে পড়ার সমস্ত খরচ বহন করেছেন, এমন কি ইংল্যান্ডে গিয়ে লেখাপড়া করার খরচও তিনিই নিজের পকেট থেকে দিয়েছেন। গৃহবন্দী থাকা অবস্থায়ও লেখক সংঘের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করে অনুবাদক ও দফতর সম্পাদকের চাকরিটা নোভাকে পাইয়ে দিয়েছেন তিনিই।

ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও, সরকার মুর্তজায়েভকে দায়িত্ব নিতে দিল না। কসোভোয় তখন সার্বরা পাইকারীভাবে মুসলমানদের হত্যা করছে। মুর্তজায়েভ প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন। দীর্ঘ সময় ধরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলল, পুরোটা সময় তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হলো।

তাঁর অন্যতম বন্ধু ম্যাক বিলিয়ার্ড দীর্ঘ কয়েক বছর লন্ডনে ছিলেন, তারপর বেলগ্রেডে ফিরে এসে ব্রিটিশ দূতাবাসে চাকরি নিয়েছেন।

বাকি থাকল ড. সিডাক ও কার্চিক জোভা।

দেবারভিল সিডাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে পুলিস বিভাগে যোগ দেন। তিনি কোনদিনই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হননি। রাজনৈতিক প্রভাবে নয়, নিজ দক্ষতার গুণেই চাকরিতে ধীরে ধীরে পদোন্নতি হয়েছে তাঁর। কিন্তু বেলগ্রেড সিক্রেট পুলিসের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হওয়ার কারণে, কৌশলে তাঁর ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। পার্টির প্রভাবশালী নেতারা, এমন কি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচও, তাঁকে ভাল চোখে দেখেন না। তিনিও পার্টি বা প্রেসিডেন্ট ভবনের অনেক অন্যায় নির্দেশ বিবেক সায় না দিলে অমান্য করেন। বেলগ্রেড সিক্রেট পুলিস বিভাগে ইন্সপেক্টরের সংখ্যা বাহাত্তরজন, তার মধ্যে বাহান্নজনকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। বাকি বিশজনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে। এই বিশজনের 'বস্' স্বয়ং প্রেসিডেন্ট। তবে মিলোসেভিচ সরাসরি তাদেরকে নির্দেশ দেন না বা তারাও সরাসরি তাঁকে রিপোর্ট করে না। উগ্র জাতীয়তাবাদী যুবদলের এক নেতাকে প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে আনঅফিশিয়ালি মনোনয়ন দেয়া হয়েছে, এই ইন্সপেক্টররা তার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ভবনের নির্দেশ পায়, রিপোর্টও করে। যুবদলের এই নেতার নাম কার্চিক জোভা।

কার্চিক জোভার অতীত রোমহর্ষক, বর্তমান বিভীষিকাময়। তিরানব্বুই সালে বসনিয়া ও কসোভোয় মুসলমানদের ওপর সার্ব হামলা শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টির চরমপন্থীরা তাকে কাজে লাগায়। যুবদলের ডাকসাইটে নেতা সে, সন্ত্রাসী

হামলা ও খুন-খারাবিতে অংশগ্রহণ করা তাকে মানায় না, অথচ প্রতিটি কুকর্মে সক্রিয়ভাবে থাকা তার চাই, নিজ হাতে করা চাই কাজগুলো। এ তার বিকৃত মানসিকতারই প্রতিফলন। যুবদলের বিরাট একটা বাহিনী নিয়ে বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোয় অভিযান চালায় সে। বসনিয়াতেই জন্ম তার, সারায়েভোর প্রতিটি মুসলিম পরিবারকে চিনত। এই পরিবারগুলোর তরুণ-তরুণীদের একটা তালিকা তৈরি করে সে, তারপর লোক পাঠিয়ে ধরে আনে সদ্য তৈরি বিভিন্ন কারাগারে। প্রতি রাতে বন্দী মুসলমান তরুণদের টরচার করত সে, ভোর রাতে মেরে ফেলত। এমনও শোনা গেছে, খুন করার পর লাশ কেটে রান্না করা হয়েছে, সেই রান্না করা মাংস খাওয়ানো হয়েছে আত্মীয়স্বজনদের। সে আর তার যুবদল প্রতি রাতে মুসলমান তরুণীদের ধর্ষণ করত। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যপন্থী একদল নেতা প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচের কাছে একবার লিখিত অভিযোগ করেন এই বলে যে কার্চিক জোডা ও তার ভাই শিশুদেরও ধর্ষণ করছে। মিলোসেভিচ ব্যাপারটাকে ভিত্তিহীন অভিযোগ বলে পাশ কাটিয়ে যান।

কসোভোয় ন্যাটো বোমাবর্ষণ করার পর বসনিয়া ও কসোভোয় জাতিসংঘ শান্তি বাহিনী পাঠায়। ওই দুই জায়গায় অভিযান চালানো বন্ধ হয়ে যায় কার্চিক জোডার। সে এরপর তার রক্তপিপাসা মেটাবার জন্যে বেছে নেয় বেলগ্রেডকে। বেলগ্রেডেও অনেক মুসলমান বসবাস করে, তাদের মধ্যে যারাই একটু নাম করে বা মাথাচাড়া দেয়, একের পর এক তাদেরকে হত্যা করছে সে। এ-ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টি ও মিলোসেভিচ সরকারের মৌন সমর্থন আছে। তার কোন সরকারী পদ নেই, কিন্তু আমলারা, এমন কি মন্ত্রীরাও তাকে সাংঘাতিক ভয় পায়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই যখন তখন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে পারে সে।

আরও অনেকের মত ম্যাক বিলিয়ার্ডও জানেন যে নিকোলাই সুনজাককে সাঈদ মুর্তজায়েভ নয়, খুন করেছে কার্চিক জোডা। এই খুনের একটা মোটিভ অন্তত পরিষ্কার। একাধিক মোটিভের একটা হলো, সুনজাকের স্ত্রী লিলিকে কার্চিক জোডা শয্যাসঙ্গিনী করতে চেয়েছিল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও এই অপকর্মটি সে করতে পারেনি। লিলি বসনিয়ার মেয়ে, জোডার সঙ্গে একই মহল্লায় বড় হয়েছেন, কিন্তু জোডাকে কখনোই তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি ক্যান্সারে মারা যাবার পর তার নজর পড়ে তার মেয়ে নোভার ওপর। যুবদলের অনেক নেতাকেই সে চ্যালেঞ্জের সুরে বলেছে, আজ হোক কাল হোক নোভাকে সে বিছানায় নেবেই।

জোডা নোভার কোন ক্ষতি করতে পারছে না শুধু বেলগ্রেড পুলিসের চীফ ড. সিডাকের জন্যে। নিকোলাই সুনজাক ও ড. সিডাক, দু'জনেই লিলিকে ভালবাসতেন, কিন্তু লিলি বিয়ে করেন সুনজাককে। সুনজাক খুন হবার পর লিলি ও তাঁর মেয়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নেন ড. সিডাক। তারপর লিলি মারা গেলে নোভাকে তিনি নিজের কাছে নিয়ে এসে রাখেন।

বিলিয়ার্ডের কথা শেষ হলো। পট থেকে আরও এক কাপ কফি ঢেলে নতুন একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। হাত তুলে কামরার চারদিকটা দেখালেন রানাকে। 'পুলিসকে আপনি রিপোর্ট করতে চান, মি. রানা?'

'কোন লাভ হবে কি? এখন এটা পরিষ্কার যে আমার পিছনে কার্চিক জোডার

দলকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার ওপর ড. সিডাকের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।'

বিলিয়ার্ড কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানতে চাইলেন, 'ফোলিকে আমি কি বলব?'

'সে কি শুধু পাণ্ডুলিপিটাই চাইছে, ডকুমেন্ট নয়?'

'মি. মুর্তজায়েভ আপনাকে যা-ই দিন, ফোলি সেটা দেখতে চায়।'

'তাকে বলুন, আগে হাতে পাই, তারপর ভেবে দেখব।'

আরেকবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছাড়লেন বিলিয়ার্ড। এই সময় আবার নক হলো দরজায়। এবার ওয়েটারের সঙ্গে একজন পোর্টার ও সেই মধ্যবয়স্কা চেম্বারমেইড ঢুকল স্যুইটে। মহিলা খোঁড়াচ্ছে, পায়ের পাতায় ব্যান্ডেজ। ওয়েটার টেবিল পরিষ্কার করছে, পোর্টার আর চেম্বারমেইড গুছাচ্ছে ঘর। বিলিয়ার্ড বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর হোটেলের ম্যানেজার রানার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কিছু চুরি গেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে রানা মাথা নাড়ল। ম্যানেজার জানালেন, পুলিসকে তিনি লিখিত অভিযোগ জানাবেন।

ঘরগুলো নতুন করে সাজাতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল। গরম পানিতে শাওয়ার সেরে শোয়ার প্রস্তুতি নিল রানা। ওয়ালথারটা চেক করল, তারপর গুঁজে রাখল বালিশের তলায়। হাতটা বের করে আনবে, আঙুলে খসখসে কি যেন ঠেকল। 'আবার!' বিড়িবিড় করল ও। আঙুলে ধরে বের করে আনল জিনিসটা। ভাঁজ করা একটা কাগজ। সাঈদ মুর্তজায়েভ আরও একটা বার্তা পাঠিয়েছেন। এটাতেও কোন সম্বোধন নেই।

'গোপন সূত্রে খবর পেয়েছি, আমাকে পাগল সাব্যস্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে। খুব তাড়াতাড়ি ওরা আমাকে পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দেবে। আমাকে যদি যুগোস্লাভিয়া থেকে বের করে নিয়ে যাবার কোন প্ল্যান থাকে, দয়া করে দেরি করবেন না। কাগজটা অবশ্যই পুড়িয়ে ফেলবেন। সাঈদ মুর্তজায়েভ।'

রানা প্রায় নিশ্চিত, এই চিরকুটটাও মধ্যবয়স্কা চেম্বারমেইড রেখে গেছে। বাথরুমে ঢুকে কাগজটা পুড়িয়ে ফেলল ও।

ছয়

সাঈদ মুর্তজায়েভের বাড়িটা শহরের একবারে শেষপ্রান্তে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা ঢাল বেয়ে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে, ঢালগুলো ঝোপ আর গাছপালায় নিশ্ছিদ্রভাবে ঢাকা। জঙ্গল ঘেরা এরকম একটা ঢালের মাথায় একতলা বাড়িটা। বাড়ির তেকোনা ছাদ লাল টালি দিয়ে তৈরি, সরু চিমনিটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। আশপাশে আর কোন বাড়ি নেই। চৌহদ্দি বিশাল হলেও, বাড়িটা বেশি বড় নয়। উঁচু পাথুরে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়াও আছে। ট্যাক্সি থেকে বাড়ির গেটে নামল রানা, ওকে নামতে দেখে গার্ডরুম থেকে দু'জন সেন্ট্রি বেরিয়ে এল, দু'জনের হাতেই স্টেন গান।

পাঁচিল ঘেঁষে খানিক পরপর একজন করে সশস্ত্র সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে, আক্ষরিক অর্থেই বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে ওরা। 'মি. মাসুদ রানা?' ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস জানতে চাইল।

কথা না বলে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেখাল রানা। লোকটা স্যালুট করল ওকে, তারপর গেট খুলে দিয়ে ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে বলল। 'আপনাকে, স্যার, ত্রিশ মিনিট সময় বরাদ্দ করা হয়েছে।' ভেতরে ঢোকার সময় ঘাড় ফিরিয়ে একবার পিছন দিকে তাকাল রানা। ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে যাচ্ছে ড্রাইভার। ভাবল, ওকে কি রেখে দেয়া উচিত ছিল?

কমপ্লিট সুট পরে এসেছে রানা, সঙ্গে হোলস্টার না থাকায় ওয়ালথারটা গুঁজে রেখেছে কোমরের কাছে বেল্টে। নোভার আশ্বাস সত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে ছিল ও। গার্ড সার্চ না করায় ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে ওর।

হোটেল থেকে রওনা হবার আগে টেলিফোনে নোভার সঙ্গে কথা বলেছে রানা। নোভাই তাকে অস্ত্রটা সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেয়। পরিষ্কার করে কিছু না বললেও, আভাসে বলেছে কথাটা–ওকে সার্চ করা হবে না। ব্যাপারটা যে মোটেও স্বস্তিকর নয়, রানার বুঝতে অসুবিধে হয়নি। সার্চ করা হবে না, এই আভাস নোভা ওকে কি করে দেয়? নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে ড. সিডাকের সঙ্গে কথা হয়েছে তার। বেলগ্রেড সিক্রেট পুলিসের চীফ যদি চান রানার সঙ্গে অস্ত্র থাকুক, তাহলে অবশ্যই ধরে নিতে হবে বিপদ ওকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে।

গেট পেরিয়ে একটা বাগানে ঢুকল রানা। বাগানটা বাড়ির একপাশে, ভেতর দিয়ে চওড়া পথ চলে গেছে উঁচু একটা বারান্দা পর্যন্ত। বাগান ওই বারান্দার সামনে শেষ হয়নি, পাশ কাটিয়ে বাড়ির পিছন দিকে পৌঁছে আরও চওড়া হয়েছে। বারান্দায় ব্যাঙের ছাতা আকৃতির একজোড়া কংক্রিটের টেবিল রয়েছে। চেয়ারগুলো কাঠের। বারান্দার তিন দিকে প্রচুর গাছপালা। ওখান থেকে বাড়ির পিছনটা পরিষ্কার দেখা যায়–অনেক নিচে গোটা বেলগ্রেড শহর শরীর বিছিয়ে রেখেছে। পিছনের ঢালে প্রচুর ঘাস, তবে কোন গাছ নেই, সব কেটে ফেলা হয়েছে। শেষ বিকেলের রোদ লেগে চশমার কাঁচ ঝিক করে উঠল, বারান্দায় কেউ একজন বসে আছে। রানা এগোচ্ছে, বারান্দার সিঁড়িতে নেমে এল সে। বিশ হাত দূর থেকে দৃষ্টিভ্রমের শিকার হলো রানা। আকৃতি, বয়স, গায়ের রঙ, চশমা ইত্যাদি অন্য এক লোকের সঙ্গে এত মেলে যে বিস্ময়ের ধাক্কাটা বেশ জোরেই লাগল ওকে।

ধাপ ক'টা বেয়ে নিচে নামল লোকটা। হাসিমুখে রানার দিকে ডান হাত বাড়িয়ে বলল, 'মাসুদ রানা? আমি সাঈদ মুর্তজায়েভ।'

গলার আওয়াজ শুনে রানার ভুল ভাঙল। তবে এ-প্রসঙ্গে কিছু বলল না ও। লক্ষ করল, পেশাদার রাজনীতিকের মত অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হ্যান্ডশেক করছেন সাঈদ মুর্তজায়েভ; জোরাল ও আন্তরিক, কিন্তু তাসত্ত্বেও নৈর্ব্যক্তিক, কোন ভাব বা অন্য কিছু ফাঁস করে না।

পথ দেখিয়ে একটা টেবিলে এনে রানাকে বসালেন মুর্তজায়েভ। সবুজ পালিশ করা আরেকটা চেয়ারে রানার মুখোমুখি বসলেন নিজে। 'প্রথমেই আমার

বন্ধু রাহাত খানের খবর বলো, রানা। কেমন আছে সে? মেডিলিন ঢাকায় গেল, তার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে?'

'বস্ ভাল আছেন,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, অলব্রাইট ওনার সঙ্গে দেখা করেছেন।'

'আমার সম্পর্কে আলাপ করল ওরা?' সাগ্রহে রানার দিকে ঝুঁকে পড়লেন মুর্তজায়েভ।

'আপনার দুই বন্ধুর একজন বললেন, সিআই এ-র ওপর তাঁর খুব একটা নিয়ন্ত্রণ নেই, তাই আপনার জন্যে কিছু করা তাঁর জন্যে অত্যন্ত কঠিন। আমরা বরং এ-প্রসঙ্গে বেশি কথা না বলে সময় বাঁচাতে পারি, তাই না?'

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে প্রফেশন্যাল হয়ে উঠলেন মুর্তজায়েভ। 'তুমিই যে মাসুদ রানা, রাহাত খানের প্রতিনিধিত্ব করছ, বুঝব কিভাবে?'

'বস্ আমাকে দিয়ে একটা বাক্য মুখস্থ করিয়েছেন,' বলল রানা। 'বাক্যটা শুনলে আপনি নাকি বুঝতে পারবেন, আমি তাঁরই প্রতিনিধিত্ব করছি। বাক্যটা হলো–"তেলাপোকার চেয়ে অনেক বেশি ভয় পাই আমি ফিরোজাকে। ওকে বোলো, বাংলাদেশেও প্রচুর তেলাপোকা আছে, খবরদার যেন না আসে!"'

রানার কথা শেষ হওয়া মাত্র গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন মুর্তজায়েভ। হাসতে হাসতে আপন মনেই বললেন, 'ও, আচ্ছা! ঘটনাটা তাহলে আজও মনে রেখেছে ও!' তারপর মুলিন হয়ে গেল চেহারাটা। রানার দিকে তাকালেন, 'ফিরোজা ছিল আমার প্রথম স্ত্রী। তখনও আমাদের বিয়ে হয়নি, রাহাতের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় কোত্থেকে একটা তেলেপোকা এসে গায়ে পড়ে, অমনি আর্তনাদ করে উঠে রাহাতকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরেছিল ও। সেই থেকে ওকে দেখলেই লাফিয়ে পিছু হটত রাহাত, বলত–তুমি আমাকে পিষেই মেরে ফেলবে!' আবার একবার মৃদু হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। তারপর বললেন, 'রাহাত জানে না, বিয়ের দুবছরের মধ্যেই মারা গেছে ফিরোজা।'

রানা বলল, 'মাত্র আধ ঘণ্টা সময় দেয়া হয়েছে আমাকে। কাজ শেষ করে সন্ধের আগেই হোটেলে ফিরতে চাই। এখানে কথা বলা নিরাপদ তো?'

'প্রতিটি ঘরে আড়িপাতা যন্ত্র আছে,' বললেন মুর্তজায়েভ। 'সেজন্যেই বারান্দায় বসেছি আমরা।'

'তাহলে ডকুমেন্টটা সম্পর্কে আমাকে একটা ধারণা দিন।'

'তিরানব্বুই সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে সারায়েভোয় সার্বরা একটা দাঙ্গা বাধিয়েছিল,' বললেন মুর্তজায়েভ। 'সেই দাঙ্গায় জ্যান্ত কবর দেয়া হয় আড়াইশো থেকে তিনশো বসনিয়ান মুসলমানকে। সেই থেকে সারায়েভোর মুসলমানরা প্রতি বছর এপ্রিল মাসের নয় তারিখে শোক দিবস পালন করে আসছে। শোক দিবস উপলক্ষ্যে মীটিং-মিছিল হয়। প্রতি বছরের মত এবারও হবে।

'যুগোস্লাভিয়া সীমান্ত থেকে বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো খুব বেশি দূরে নয়। সীমান্ত থেকে বিশ মাইল চওড়া, দেড়শো মাইল লম্বা একটা জায়গা আছে। জায়গাটা যুগোস্লাভিয়ার পশ্চিমে, সারায়েভোর পুবে। সাতশো বছর আগে এই জায়গা সার্বিয়ার ছিল, এটা সাবদের একটা পুরানো দাবি। অনেক চেষ্টা করেও জায়গাটার দখল নিতে পারেনি তারা। ন্যাটো কসোভোয় বোমাবর্ষণ করার পর

এলাকায় এখন খানিকটা স্থিতি এসেছে, সবার মধ্যেই গা ছাড়া একটা ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। আর এই সুযোগে ওই জায়গাটা দখল করবে বলে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে মিলোসেভিচ সরকার।

'শোকদিবস মিছিল-মীটিং হবে সারায়েভোয়। সেই মীটিঙে, স্বভাবতই, বসনিয়ান সার্বরা অংশ গ্রহণ করবে না। অংশ গ্রহণ করা তো দূরের কথা, সেদিন তারা কেউ ঘর থেকেই বেরুবে না। কিন্তু ঘর থেকে না বেরুলে কি হবে, মিছিলের লোকজন বেছে বেছে সার্বদের বাড়িতে ঢুকে দেড় থেকে দুশো সার্বকে গুলি করে মারবে।'

'মানে?' রানা হতভম্ব।

হাত তুলে রানাকে শান্ত হতে বললেন মুর্তজায়েভ। 'প্ল্যানটা সেভাবেই করেছে মিলোসেভিচ। দুনিয়ার লোক জানবে মুসলমানদের মিছিল থেকে সার্বদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। ডকুমেন্টে স্পষ্ট লেখা আছে, হামলাটা আসলে করবে কার্চিক জোডার নেতৃত্বে উগ্র সার্ব জাতীয়তাবাদী যুবদল। পাইকারী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে সারায়েভোর পুবদিকে সৈন্য পাঠাবার অজুহাত তৈরি করতে চায় ওরা। ঘরের ভেতর দেড়শো থেকে দুশো সার্ব খুন হলে যুগোস্লাভিয়া যদি সৈন্য পাঠায়, দুনিয়ার মানুষ সেটাকে অযৌক্তিক বলবে না। মোট কথা, সারায়েভোর একটা অংশ মিলোসেভিচ দখল করবেই, তার বিনিময়ে স্বজাতির দেড়-দুশো লোককে বলি দিতে তার আপত্তি নেই।'

রানার হাতের তালু ঘামছে। 'ডকুমেন্টটা আপনি পড়েছেন?'

'না, আমি পড়িনি,' মুর্তজায়েভ বললেন। 'তবে যে লোক ফাইলটা প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে চুরি করে আনে সে পড়েছে। তার মুখ থেকেই সব জেনেছেন আমার স্ত্রী, তাঁর থেকে আমি। চুরি করার পর সেই রাতেই সিক্রেট পুলিস তাকে গ্রেফতার করে, পরদিন সকালে সে মারা যায়। শুনেছি তার স্ত্রীকেও ওরা খুন করেছে।'

'ফাইলের ফটোস্ট্যাট করা কপিটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে, তাই না? তাহলে আপনি সেটা পড়েননি কেন?'

'প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে ফাইলের ফটোস্ট্যাট করা কপিই চুরি যায়,' বললেন মুর্তজায়েভ। 'কিন্তু ফটোস্ট্যাট মেশিনের অপারেটর চুরি করার পর বাড়ি ফেরার আগে গোপন এক ফটো-স্টুডিও থেকে কপি করা ফাইলটার মাইক্রোফিল্ম তৈরি করায়। তার বাড়ি থেকে আমার স্ত্রী সেই মাইক্রোফিল্ম নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দেন। ফাইলের ফটোস্ট্যাট করা কপি স্টুডিওতেই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। মাইক্রোফিল্মটা এত ছোট যে একটা বোতামের ভেতরও লুকিয়ে রাখা সম্ভব। মাইক্রোফিল্ম বলেই আমার পক্ষে ওটা পড়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, সময়ও ছিল না।'

'কিন্তু এখান থেকে আমি এখন বেরুলেই ওরা আমাকে সার্চ করবে,' বলল রানা। 'যত ছোটই হোক, যেখানেই লুকিয়ে রাখি, বডি সার্চ করলে ওরা সেটা ঠিকই পেয়ে যাবে। এ-ব্যাপারে আপনার কোন পরামর্শ আছে?'

মুর্তজায়েভ হাসছেন। 'মাইক্রোফিল্মটা আমি নিজের কাছে রাখিনি, রানা। ওটা যখন পাই, কাজ সেরে বাড়ির ঝি—সে আমার আত্মীয়াও হয়—ফিরে যাচ্ছিল।

জানতাম আমার বাড়ি সার্চ করবে পুলিস, তাই তার মাধ্যমে আরেক আত্মীয়র কাছে পাঠিয়ে দিই।'

'এবার পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গ,' বলল রানা। 'আপনি যাই লিখে থাকুন, সিআইএ ওটা দেখতে চায়। আর মিলোসেভিচ সরকার চাইছে আপনার কোন পাণ্ডুলিপি যেন যুগোস্লাভিয়া থেকে বাইরে কোথাও পাচার করা না যায়। কারণটা কি?'

'সিআইএ-র উদ্বিগ্ন হবার কারণ আছে,' বললেন মুর্তজায়েভ। 'আমি বলকানের রাজনীতির ওপর যে বইটা লিখেছি তাতে প্রমাণ সহ বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র যতই দরদী সাজার ভান করুক, আসলে এই এলাকায় প্রতিটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির বিরুদ্ধে কাজ করছে তারা। রাশিয়াকে খুশি করার জন্যে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সার্বদের পক্ষে গেছে। এটা প্রকাশ হলে বিশ্ব সমাজে যুক্তরাষ্ট্রের মুখোশ খসে পড়বে, সেজন্যেই সিআইএ পাণ্ডুলিপিটা নষ্ট করে ফেলতে চায়। আমার ওই বইয়ে মিলোসেভিচ সরকারেরও নানা কুকীর্তির কথা ফাঁস করা হয়েছে, ফলে তারাও চায় না বইটা ছাপা হোক।' টেবিলে রাখা একটা বাক্স থেকে চুরুট নিয়ে ধরালেন তিনি। রানা লক্ষ করল, তাঁর এই চুরুট খাওয়ার অভ্যাসটাও আরেক লোকের সঙ্গে মিলে যায়। 'ওই বইটা বাদেও আরও দুটো বই লিখেছি আমি,' আবার শুরু করলেন মুর্তজায়েভ। 'দ্বিতীয় বইটা আমার আত্মজীবনী। এছাড়া একটা কবিতার বই···'

'আত্মজীবনীতে নিশ্চয়ই আপনার বাল্য বন্ধু নিকোলাই সুনজাক প্রসঙ্গও থাকবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন মুর্তজায়েভ। 'সুনজাক সহ আমার সব ক'জন বন্ধুর কথাই লিখেছি আমি। পাহাড়ে আমি পালিয়ে যাবার পর সুনজাক কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, কিভাবে সে খুন হলো, ম্যাট বিলিয়ার্ড এই বেলগ্রেডে কিভাবে একবার নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে বাঁচায়, পরে কিভাবে তার মাধ্যমে সুনজাকের মেয়ে নোভাকে আমি সাহায্য করেছি ইত্যাদি সব প্রসঙ্গই থাকবে তাতে।'

'সুনজাকের মৃত্যু সম্পর্কে কিছু যদি বলেন।'

'সুনজাক আর জোডা পাহাড়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।' অতীতে ফিরে গেলেন সাঈদ মুর্তজায়েভ। 'ওদের ইচ্ছা ছিল আমাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মূল দলে ফিরে যেতে রাজি করাবে। এই নিয়ে সুনজাকের সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক হয়। তর্কে হেরে গিয়ে আমার ক্যাম্প থেকে রাগ করে বেরিয়ে যায় সে, আমি তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে পিছু নিই। সে-সময় জোডা আমাদের সঙ্গে ছিল না। জঙ্গলের ভেতর আমি সুনজাককে হারিয়ে ফেলি। কিছুক্ষণ পর অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ হয়। সেই আওয়াজ অনুসরণ করে ছুটে যাই আমি, দেখি পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সুনজাক। একটু পরই সেখানে হাজির হয় কার্চিক জোডা। আমার দলের ক্যাডাররাও গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে আসে। সবার সামনে জোডা আমাকে বলল, "কাজটা তুমি ভাল করলে না, সাঈদ।" আমি এমন হতভম্ব হয়ে পড়ি যে প্রতিবাদও করতে পারিনি। যাই হোক, নিজের দল নিয়ে বেলগ্রেডে ফিরে যায় জোডা, খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে জানায়

সুনজাককে আমি খুন করেছি।

'জোডার সঙ্গে দু'মাস পর আবার আমার দেখা হয়। সিক্রেট পুলিস আমাকে গ্রেফতার করতে আসে, তাদের সঙ্গে জোডাও ছিল। আমি ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছি, জোডাই সুনজাককে খুন করেছে, কিন্তু আমার হাতে কোন প্রমাণ ছিল না। পুলিসের সামনেই বোকার মত আমি তাকে দোষারোপ করি। আমার মুখের ওপর হাসতে শুরু করে সে। খুনের কথা স্বীকার বা অস্বীকার, কোনটাই করেনি সে, শুধু হাসছিল। তার ওই হাসি দেখে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। পুলিস বাধা দেয়ার আগেই আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। মাটিতে ফেলে গলা টিপে ধরেছিলাম। সে একটা ছুরি বের করে আমার বুকে গাঁথার চেষ্টা করে। তার ওই ছুরি কেড়ে নিয়ে পোচ দিই গলায়। ঘা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জোডার গলায় ওই দাগটা থাকবে।'

'এবার কিন্তু জোডা মরিয়া হয়ে উঠেছে,' মুর্তজায়েভ থামতে বলল রানা। 'ডকুমেন্টটা না পেলে আপনাকে সে ছাড়বে না।'

'আমি জানি।' চুরুটটা মুখের সামনে তুলেও হাতটা নামিয়ে আনলেন মুর্তজায়েভ। 'নোভি সাদ-এর সরকারী মেন্টাল হসপিটালে আমার এক আত্মীয় আছে, সে আমাকে জানিয়ে গেছে জোডা ওই হসপিটালে গিয়েছিল। পাগলা-গারদের ডিরেক্টরকে জোডা নির্দেশ দিয়েছে আমার জন্যে একটা সেল খালি করে রাখতে। সেজন্যেই আমি অস্থির হয়ে উঠেছি, রানা। একবার যদি পাগলা-গারদে নিয়ে যায় আমাকে, ওখান থেকে কোনদিনই আর বেরুতে পারব না। রাহাত তোমাকে পাঠিয়েছে, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমার প্ল্যানটা কি?'

বাড়ির অন্দরমহল থেকে একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'সাঈদ, তোমার টেলিফোন।'

'এক্সকিউজ মি,' বলে চেয়ার ছাড়লেন মুর্তজায়েভ, বারান্দা থেকে ঘরে চলে গেলেন।

হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে ইংরেজি দৈনিকটা টেনে নিল রানা। প্রথম পাতা জুড়ে রাজনৈতিক হত্যার খবর ছাপা হয়েছে। শুধু এক কোণে ছোট্ট একটা খবর দেখল রানা, রাজনীতির সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। গরমের দিনেও কোন কোন এলাকায় প্রচণ্ড কুয়াশা দেখা যাচ্ছে, আকস্মিক শীতে জনজীবন বিপর্যস্ত, কসোভোর জঙ্গলে দাবাগ্নি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

'দাবাগ্নি,' আপনমনে বিড়বিড় করল রানা।

'গেট থেকে গার্ডরা ফোন করেছিল,' বারান্দায় ফিরে এসে মুর্তজায়েভ বললেন। 'তোমাকে আরও দশ মিনিট সময় দেয়া হয়েছে।' পকেট থেকে বের করে রানার সামনে টেবিলে একটা চাবি রাখলেন তিনি। 'এটা তুমি খুব যত্ন করে রাখবে, রানা। ওটা কিসের চাবি একটু পর তোমাকে বলছি।'

'আমার একটা প্ল্যান আছে, কিন্তু সেটা বলার আগে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই,' চাবিটা রিঙে আটকে পকেটে রাখল রানা। 'আমার প্রথম প্রশ্নটা ব্যক্তিগত, তবে অপ্রাসঙ্গিক নয়। আপনি আমাকে মেসেজ পাঠাবার ঝুঁকি কেন নিতে গেলেন? এই ঝুঁকি না নিলে আপনার ভাগ্নে আলভিক নুরানিক খুন হত না।'

'আলভিকের খুন হওয়াটা সত্যি দুঃখজনক, রানা,' ধীরে ধীরে বললেন মুর্তজায়েভ। 'তবে সান্ত্বনা এই যে তিন মাসের মধ্যে এমনিতেই মারা যেত ও। ব্লাড ক্যান্সার। তোমাকে সাবধান করার জন্যে খবর পাঠানোর দরকার ছিল, শুনে আলভিক জেদ ধরল ও-ই নিয়ে যাবে মেসেজ। ওকে সার্চ করা হবে জেনে মৌখিক মেসেজ দিয়েছিলাম। আর চিরকুট দুটো আমার আত্মীয়া গুলশানকে দিয়ে পাঠিয়েছি। শুধু হোটেলে নয়, আমার বাড়িতেও কাজ করে ও।'

'আমি আঁচ করেছিলাম। আলভিককে সার্চ করে কিছু না পেয়ে ওর পিছু নিয়ে হোটেলে গিয়েছে কার্চিকের ভাই জার্জিক জোডা, ওর পিছু নিয়েই ঢুকেছে আমার কামরায়, এবং মেসেজ দেয়ার মুহূর্তে খুন করেছে। যাই হোক, এবার আমার প্ল্যানটা সম্পর্কে বলি। আপনাকে এই বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া আমার জন্যে খুব বড় কোন সমস্যা নয়,' বলল রানা। 'আপনি কি সীমান্ত পার হয়ে বসনিয়ায় যেতে চান, নাকি সাগর হয়ে ইটালিতে?'

'তুমি বলছ পুলিসের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমাকে বের করে নিয়ে যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব?' মুর্তজায়েভের চোখে অবিশ্বাস।

রানা হাসল। 'হ্যাঁ, সম্ভব। কিভাবে কি করব সব আমার ওপর ছেড়ে দিন। তবে আমি যখন আপনাকে নিতে আসব, দশ কি পনেরো মিনিটের বেশি সময় পাবেন না। কি করতে হবে বলে যাচ্ছি আমি, সেভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। এবার বলুন, কোন পথে পালানোটা পছন্দ করবেন আপনি।'

'সীমান্ত পার হয়ে বসনিয়ায় যাবার কোন মানে হয় না,' মুর্তজায়েভ চিন্তিত ভাবে বললেন। 'কার্চিক জোডার হাত অনেক লম্বা, রানা। বসনিয়ায় তার এজেন্ট আছে। না, সাগর পথে পালানোই বোধহয় ভাল।'

'সেক্ষেত্রে আমাকে কোটর আর বাডভা, এই দুই জায়গা সম্পর্কে একটা ধারণা দিন। শুনেছি কোটর আর বাডভায় প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচের ব্যক্তিগত বনভূমি আছে, সেখানে তিনি প্রায়ই বন্যপ্রাণী শিকার করতে যান। এ-ও শুনেছি যে সার্ব ব্যবসায়ীরা বাডভা উপকূল ইজারা নিয়েছে, স্থানীয় জেলেদের হটিয়ে দিয়ে একচেটিয়াভাবে তারাই মাছ ধরে।'

'ড. সিভাক, সুনজাক আর আমার বাড়ি মন্টিনিগ্রোর কোটরে,' বললেন মুর্তজায়েভ। 'তবে সুনজাক আর আমাদের পারিবারিক খামার আছে বাডভায়। এরকম পাঁচ-সাতটা খামার আর পাঁচিল ঘেরা ছোট্ট শহরটা বাদ দিয়ে গোটা এলাকাই লীজ নিয়েছে মিলোসেভিচ। হ্যাঁ, প্রতি শীতে ওখানে শিকার করতে যায় সে। বছরের অন্যান্য সময় তার বন্ধু-বান্ধবরাও যায় বলে শুনেছি। গোটা এলাকায় লোকবসতি নেই বললেই চলে, শুধু জঙ্গল আর পাহাড়। আর কি যেন জিজ্ঞেস করলে? ও, হ্যাঁ, সার্ব ব্যবসায়ীরা সাগরে নিজেদের জেলে নামিয়ে মাছ ধরে। এঞ্জিন নৌকা আর ট্রলার ব্যবহার করে ওরা। নিষেধ করা হলেও, স্থানীয় জেলেরা মাঝে মধ্যে গোপনে মাছ ধরার চেষ্টা করে। তাদেরকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়া আছে। সার্ব জেলেদের আলাদাভাবে চেনার জন্যে লাল ফতুয়া দেয়া হয়েছে বলে শুনেছি।'

'এবার বলুন মাইক্রোফিল্মটা কোথায় আছে,' জানতে চাইল রানা। 'প্রথমে

আমাকে ওটা পেতে হবে, দেখতে হবে কি আছে তাতে, শুধু তারপরই আমি পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে পারব।'

মুর্তজায়েভকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'তারমানে কি ওটা না পেলে তুমি আমাকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে না?'

পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'ব্যাপারটা কি অনিশ্চিত, মি. মুর্তজায়েভ? না পাবার আশঙ্কাও আছে?'

'না, ঠিক তা নয়।' ইতস্তত করছেন মুর্তজায়েভ, সন্দেহে ভুগছেন। 'আসলে জিনিসটা তো আমার হাতে নেই, তাই জোর করে কি করে বলি যে···'

'পাইকারী হত্যাকাণ্ড, বসনিয়ার অংশবিশেষ দখল ইত্যাদি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আপনি জেনেছেন, এখন আমিও জানি। আমরা রিপোর্ট করলে জাতিসংঘ অবশ্যই অ্যাকশন নেবে। কিন্তু তাতে শুধু ষড়যন্ত্রটা হয়তো ব্যর্থ করা যাবে, তার বেশি কিছু নয়। এই ষড়যন্ত্রের যারা হোতা তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে প্রমাণ দরকার। কাজেই মাইক্রোফিল্মটা অবশ্যই আমার হাতে আসতে হবে।'

'সেক্ষেত্রে তোমার যুক্তিই ঠিক আছে,' বললেন মুর্তজায়েভ। 'আগে তুমি ওটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করো, তারপর আমাকে বের করে নিয়ে যাও। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ওটা আমি বাডভায় পাঠিয়ে দিয়েছি, রানা। কোটর হয়ে বাডভায় যেতে হবে তোমাকে।'

'আমি বাডভায় গেলে পুলিস সন্দেহ করবে না?'

'না, করবে না, কারণ ওরা তো আর জানে না যে ডকুমেন্ট আর পাণ্ডুলিপি বাডভায় আছে। তুমি ভাব দেখাবে আমার কাছ থেকে কিছু না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছ। যুগোস্লাভিয়া ত্যাগ করার আগে মন্ট্রিনিগ্রো, অর্থাৎ কোটর আর বাডভায় বেড়াবার ইচ্ছা তোমার হতেই পারে। অনেক বিদেশী ট্যুরিস্টই মিলোসেভিচের গেইম রিজার্ভ দেখতে যায়।'

'ঠিক আছে, কোটর হয়ে বাডভায় গেলাম আমি। তারপর?'

'কোটরে একটা সরাইখানা আছে, নাম ভার্নি। ওখানে উঠবে তুমি। আমার এক আত্মীয় তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। সেই তোমাকে কোটর থেকে বাডভায় নিয়ে যাবে। পাণ্ডুলিপি আর মাইক্রোফিল্ম একটা স্টীল-এর বাক্সে আছে। ওই বাক্সের চাবিই তোমাকে দিয়েছি। বাক্সের ভেতর মাইক্রোফিল্ম আছে, আমার আত্মীয় সে-কথা জানে না।'

'আমি তাকে চিনব কিভাবে?'

'সে তোমাকে বলবে—"সুনজাক আমার বন্ধু ছিল"।' হাসলেন মুর্তজায়েভ। 'সত্যি ছিল।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'বাডভায় গিয়ে বাক্সটা নেব আমি। তারপর বেলগ্রেডে ফিরে আসব। ফিরেই আপনাকে ফোন করব। আপনি আমাকে আর ড. সিডাককে বাড়িতে চা খেতে ডাকবেন।'

'তোমার সঙ্গে সিডাককেও ডাকব?' মুর্তজায়েভ অবাক হলেন। 'কেন?'

কেন, সেটা পরে জানতে পারবেন।'

কিন্তু শুধু চা খেতে ডাকলে সিডাক যদি না আসে?'

'বলবেন, আপনার কাছে পাণ্ডুলিপি আছে, আর আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দলিল, আমরা এসে ওগুলো যেন নিয়ে যাই। ওগুলো আপনি ড. সিডাকের হাতেই তুলে দিতে চান, তবে আমার উপস্থিতিতে।'

'তারপর?'

'তারপর আপনাকে আমি এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব।'

'কিন্তু কিভাবে? তাছাড়া, আমাকে না হয় বের করে নিয়ে গেলে, আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের কি হবে?'

'প্ল্যানটা তাহলে খুলেই বলি আপনাকে...'

সাত মিনিট ধরে নিজের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করল রানা। মুর্তজায়েভ নোট নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিষেধ করল ও। মাঝখানে ব্যাখ্যা থামিয়ে মিসেস ফাতেমা মুর্তজায়েভকে ডাকা হলো। ভদ্রমহিলা মুর্তজায়েভের ছাত্রী ছিলেন, তাঁর চেয়ে প্রায় বিশ বছরের ছোট। পরিচয় ও কুশলাদি বিনিময়ের পর তাঁকে কখন কি করতে হবে সব বুঝিয়ে বলল রানা।

সবশেষে আবার কার্চিক জোড়া প্রসঙ্গ ফিরে এল। মুর্তজায়েভ থমথমে গলায় বললেন, 'আমি একটা পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। প্রথম সুযোগেই আমার উচিত ছিল জোডাকে খুন করা। তুমি যদি সুযোগ পাও, রানা, অবশ্যই তাকে খুন করবে। জীবনে যত পাপই করে থাকো, যত বড়ই হোক, তাকে খুন করতে পারলে নির্ঘাত তা মাফ হয়ে যাবে।'

আবার টেলিফোন বাজছে, শুনতে পেয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা। হ্যান্ডশেক করার সময় মুর্তজায়েভকে বলল, 'কোটর থেকে ফিরে এসে আমি আপনার ফোনের অপেক্ষায় থাকব।'

'আল্লাহ তোমার সহায় হোন,' বিড়বিড় করলেন মুর্তজায়েভ।

সাত

গেট পার হয়ে বাড়ি থেকে বেরুতেই নিজের ভুলটা ধরতে পারল রানা। ফাঁকা রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে, কোথাও কোন গাড়ি নেই। ওর আসলে উচিত ছিল ফোনে একটা ট্যাক্সি ডাকা। আবার বাড়ির ভেতর ফিরে যাবে কিনা ভাবল। না, মুর্তজা দম্পতিকে বিব্রত করা হবে। তাছাড়া, গার্ডরাও হয়তো অনুমতি দেবে না।

অগত্যা হাঁটতে শুরু করল ও। একটু অবাকই হলো, গার্ডরা ওকে সার্চ না করেই যেতে দিচ্ছে।

একশো গজ এগিয়ে প্রথম বাঁকটা ঘুরল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না—না কোন পথিক, না কোন গাড়ি। সামনেও পরবর্তী বাঁক পর্যন্ত পুরোপুরি ফাঁকা রাস্তা। বেল্ট থেকে ওয়ালথারটা বের করে অ্যামিউনিশন আর সেফটি চেক করল ও, তারপর ওভারকোট খুলে ঝোলাল কনুইয়ের ভাঁজে, অস্ত্রটা রাখল কোট আর বাহুর মাঝখানে।

আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা ক্রমশ নিচু হয়ে নেমে গেছে। দু'পাশে কখনও দেখা যাচ্ছে উঁচু পাঁচিল, আবার কখনও কাঁটাতারের বেড়া। বেড়ার গায়ে লতানো গাছ থাকায় ভিলাগুলোকে রাস্তা থেকে দেখা যায় না। রানার চোখ-কান সতর্ক হয়ে আছে। কাউকে দেখতে না পেলেও, শিরশিরে একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর, যেন আড়াল থেকে কেউ ওকে লক্ষ করছে।

অ্যামবুশের জন্যে জায়গাটা আদর্শ। এখানে যদি কোন গুলি হয়, আশপাশের ভিলা থেকে কেউ দেখতে আসবে না কার লাশ পড়ল। দৌড়ে এলাকাটা পার হয়ে যাবার অদম্য ঝোঁক চাপলেও, দৃঢ় অথচ অলস একটা ভঙ্গিতে হাঁটছে রানা। আড়াল থেকে যে-ই লক্ষ করুক, তাকে বুঝতে দিতে চায় না যে ও নার্ভাস বোধ করছে। ডান পাশে হঠাৎ একটা ঝোপ ঝাঁকি খাওয়ায় বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর। কোটের আড়াল থেকে চোখের পলকে ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথারটা। ডানা ঝাপটে ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল সোনালি একটা চিল, ঝোপ থেকে বাচ্চা একটা খরগোস ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পিস্তলটা আবার জায়গা মত রেখে দিল রানা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর পাশের বেড়া বিস্ফোরিত হলো, কয়েকটা কাঠের টুকরো বর্শার মত ছুটে গেল চারদিকে। ডাইভ দিয়ে রাস্তার ওপর পড়ল রানা, উপলব্ধি করল হাই-পাওয়ারড্ রাইফেল দিয়ে কেউ একজন গুলি করছে ওকে। কড়াৎ! দ্বিতীয় বুলেটটা ছুটে এল একটু পরেই, এবার চুরমার করল উল্টোদিকের খানিকটা বেড়া। স্নাইপার ওকে একজোড়া ব্র্যাকেট-এর মধ্যে আটকে ফেলেছে। মনে মনে হিসাব কষে রানা আন্দাজ করল, ওর পিছন দিকের পেঁচানো পাহাড়ী রাস্তায় রয়েছে লোকটা, ওর রাস্তা থেকে অনেকটা ওপরে। রাস্তায় শুয়েই ঘাড় বাঁকা করে তাকাল ও। রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু লোকজন চোখে পড়ছে না। দেখতে পেলেও কোন লাভ হত না, ওয়ালথারের রেঞ্জ থেকে অনেক দূরে রাস্তাটা। তৃতীয় বুলেটটা বাতাসে শিস কেটে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। ক্রল করে রাস্তা থেকে ফুটপাথে উঠে এল রানা। বিপদের সময় আপনা থেকেই শান্ত হয়ে এল মাথাটা। বাঁচার একটাই উপায় দেখতে পাচ্ছে ও—এই রাস্তা ত্যাগ করা। আর তা করতে হলে সামনের বাঁকটা ওকে ঘুরতে হবে।

ফুটপাথ ধরে ক্রল করে এগোচ্ছে, নাকের এক হাত সামনে কংক্রিটের উপর লাগল বুলেট, কণাগুলো ছিটকে চোখেমুখে আঘাত করল। স্থির হয়ে গেল রানা। স্নাইপার ওকে নিয়ে খেলছে। যেখানে খুশি গুলি করে বুঝিয়ে দিচ্ছে, ইচ্ছে করলেই ওকে খুন করতে পারে সে। লোকটা যেহেতু মার্কসম্যান, তার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে, ইচ্ছে করলে প্রথম গুলিতেই খুন করতে পারত।

এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। কালো একটা মার্সিডিজ। রানার সন্দেহ হলো, গাড়িটাকে আগেও একবার কোথাও দেখেছে ও। তারপর মনে পড়ল—নোভার ফ্ল্যাটে যাবার সময় হোটেল থেকে ট্যাক্সি নেয় ও, তখনই রাস্তার ওপার থেকে একটা কালো মার্সিডিজ ওর পিছু নিয়েছিল। এটাই কি সেটা?

রানা ভাবছে এখন কি করবে। ড্রাইভারকে গুলি করবে, নাকি চাকায় গুলি

করে অচল করে দেবে গাড়িটা? কিন্তু এ-গাড়ি যদি সেই গাড়ি না হয়?

তীর বেগে ছুটে আসছে মার্সিডিজ। ওয়ালথারটা ডান হাতে নিল রানা, রাস্তায় বাম কনুই ঠেকিয়ে ডান কব্জি রাখল হাতের তালুতে। গাড়ি কাছে চলে এসেছে, কিন্তু থামার কোন লক্ষণ নেই। জানালা থেকে উড়াল দিল বোতলটা, সরাসরি ওর দিকে ভেসে আসছে। দেখেই জিনিসটা চিনতে পারল রানা। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল, পরমুহূর্তে যেখানে বোতলটা পড়ার কথা সেখান থেকে সরে যাবার জন্যে ঝাঁপ দিল আরেক দিকে। ডাইভ দেয়া অবস্থায়, শূন্যে রয়েছে ও, কাঁচ ভাঙার আওয়াজ শুনতে পেল, দেখল ওভারকোটটায় আগুন ধরে গেছে। উল পোড়ার কটু গন্ধ ঢুকল নাকে। বাম হাতটা ঝাঁকিয়ে কোট খসাল ও, কিন্তু এরই মধ্যে জ্যাকেটের আস্তিনেও ধরে গেছে আগুন। আশঙ্কা করছে যে-কোন মুহূর্তে বুলেটের ধাক্কা খাবে, এক লাফে সিধে হলো, টেনে-হিঁচড়ে গা থেকে খুলে ফেলল জ্যাকেটটা, পা দিয়ে মাড়িয়ে আগুন নেভাচ্ছে। আট থেকে দশ ফুট উঁচু একটা আগুন জ্বলছে রাস্তায়, আলকাতরা গলে যাচ্ছে। ওর গুলি সময়ের আগেই ফাটিয়ে দিয়েছে মলোটভ ককটেলটাকে, ফলে শুধু জ্বলন্ত গ্যাসোলিনের বাইরের কিনারা ওর কোটের নাগাল পেয়েছিল।

ঘাড় ফিরিয়ে মার্সিডিজের দিকে তাকাল রানা, হাতে ওয়ালথার প্রস্তুত। রাস্তার শেষ মাথায় প্রকাণ্ড একটা মিতসুবিসি দেখতে পেল ও, আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে পথ বন্ধ করে রেখেছে। কালো মার্সিডিজ সজোরে ব্রেক কষল, কাতর আর্তনাদ করে উঠল টায়ার, তারপরই শোনা গেল কর্কশ ধাতব সংঘর্ষের গা রিরি করা শব্দ। প্রকাণ্ড জীপে ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এল মার্সিডিজ, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল রাস্তার ধারে।

মার্সিডিজ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল সেই কালো লেদার জ্যাকেট। লাফ দিয়ে সিধে হলো সে, হাতে অস্ত্র, সরাসরি রানার দিকে ছুটে আসছে। লোকটা গোলগাল আকৃতির, মোটা, কিন্তু পায়ে যেন এক্সপ্রেস ট্রেনের গতি। জীপের পিছন থেকে তিনজন লোক উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, এখন তারাও ছুটে আসছে কালো জ্যাকেটের পিছু নিয়ে। তিনজনের মধ্যে একজনকে চিনতে পারল রানা। ড. সিডাক। বাকি লোক দু'জন বেল্ট লাগানো রেনকোট পরে আছে। তিনজনই ওরা ধাওয়া করছে লেদার জ্যাকেটকে। পাহাড় পেঁচানো রাস্তা থেকে আবার গর্জে উঠল রাইফেলটা। ড. সিডাকের একজন সঙ্গী মুখ থুবড়ে রাস্তার ওপর পড়ে গেল, তারপর আর নড়ল না।

আরেকটা গুলি হলো, তবে লাগল না কাউকে। মাথা ঘুরিয়ে পাহাড়টার দিকে তাকাল রানা। ওদিকের রাস্তায় এখন দু'জন লোক দেখা যাচ্ছে। আকাশের দিকে খাড়া একটা রাইফেল নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে তারা। তাদের মধ্যে একজন সেই তালগাছ, কার্চিক জোড়ার যমজ ভাই জর্জিক। অপরজনকে দেখে মনে হলো জেমস ফোলি। তবে রানা নিশ্চিত হবার আগেই ধস্তাধস্তি করতে করতে চোখের আড়ালে চলে গেল তারা।

লেদার জ্যাকেট রানার দিকে তীর বেগে ছুটে আসছে, তবে ড. সিডাকের পায়ের গতি তার চেয়েও বেশি মনে হলো। সামনে রানা, পিছনে ড. সিডাক,

ফাঁদে পড়ে গেছে লেদার জ্যাকেট। হঠাৎ ঘুরল সে, সরাসরি ড. সিডাকের দিকে অস্ত্র তুলল। তবে তার আগে গর্জে উঠল রানার ওয়ালথার। লেদার জ্যাকেটের ডান কাঁধ চুরমার হয়ে গেল। হাত থেকে খসে পড়া পিস্তলটা তোলার জন্যে ঝুঁকল সে, এই সময় ড. সিডাক ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পুলিস প্রধানের এক হাতে রিভলবার, অপর হাতে লংশোরম্যান'স লোডিং হুক, রানার হোটেল কামরায় যেটা পাওয়া গিয়েছিল। লোহার রডটা সবেগে লেদার জ্যাকেটের উন্মুক্ত ঘাড়ে নামিয়ে আনলেন তিনি। আর্তনাদ করে রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ল লোকটা, রডটা তার হৃৎপিণ্ডে গেঁথে গেছে। কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল স্থূল শরীরটা।

তার পাশে দাঁড়িয়ে সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছেন ড. সিডাক। দিগন্তের কাছে ঝুলে থাকা সূর্যের আলো প্রতিফলিত হলো তাঁর চশমার কাঁচে। রানা দেখল, লেদার জ্যাকেটের মাথায় একটা পা রাখলেন ড. সিডাক। তবে তা মাত্র মুহূর্তের জন্যে। রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে জোর করে ক্ষীণ একটু হাসলেন। 'মলোটভ ককটেলের বদলে ওরা যদি গ্রেনেড ব্যবহার করত···' বাক্যটা তিনি শেষ করলেন না। যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, এমন ভঙ্গিতে কপালে হাত রেখে পাহাড়টার দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

'স্নাইপার লোকটা ইচ্ছে করলে আমাকে মেরে ফেলতে পারত,' বলল রানা। 'আমাকে নিয়ে তার বোধহয় অন্য কোন প্ল্যান ছিল।' হাতের ওয়ালথারটা বেল্টে গুঁজে রাখল ও।

'রাইফেল নিয়ে ওখানে কে আছে, আপনি চিনতে পেরেছেন?'

'সম্ভবত কার্চিক জোডার ভাই।'

রেনকোট পরা অক্ষত লোকটা ফিসফিস করল, সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ড. সিডাক। প্রতিবার একটা করে লাশ বয়ে নিয়ে গেল সে, জীপে তুলল, তারপর স্টার্ট দিয়ে চলে গেল। জীপটা চলে যাবার পর ওদিকে এখন আরও একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে।

পাহাড়ের দিকে আবার তাকালেন ড. সিডাক। 'ঠিক বুঝতে পারছি না, রাইফেলটা চুপ করে আছে কেন।'

নিজের জ্যাকেটটা তুলে আনল রানা। পকেট থেকে সমস্ত কাগজ-পত্র বের করে ট্রাউজারের পকেটে ভরল। মলোটভ ককটেলটা এখনও জ্বলছে, তবে নিভে এসেছে আগুন। রাস্তার ওপর তরল আলকাতরা গড়াচ্ছে। গ্রেনেড ব্যবহার করা হয়নি, কারণ ডকুমেন্ট ও পাণ্ডুলিপি সহ রানাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল ওরা। জ্যাকেটের আস্তিন পুড়ে গেছে, তবু সেটা গায়ে চড়াল রানা।

'কোথায় ওটা, মি. রানা?'

'কোথায় কোনটা?' না বোঝার ভান করল রানা।

'পাণ্ডুলিপি আর টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট।' চশমার ভেতর ড. সিডাকের চোখে পলক পড়ছে না।

মাথা নাড়ল রানা। 'ডকুমেন্ট সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেননি মুর্তজায়েভ।'

'আপনি জিজ্ঞেস করেননি?'

'অবশ্যই জিজ্ঞেস করেছি,' বলল রানা। 'কিন্তু প্রশ্নটা কৌশলে এড়িয়ে গেছেন

তিনি।'

'তারমানে ফাইলটার ফটোস্ট্যাট করা কপি তাঁর কাছে আছে?'

'থাকতে পারে, তবে স্বীকার বা অস্বীকার কোনটাই করেননি। আমাকে তিনি শুধু তাঁর পাণ্ডুলিপির কথা বলেছেন।'

'কি বলেছেন?'

'মোট তিনটে পাণ্ডুলিপি, ড. সিডাক,' বলল রানা। 'কিন্তু কোনটাই কমপ্লিট নয়। বলেছেন কমপ্লিট হলেই তিনি আমাকে জানাবেন।'

'আপনি সত্যি কথা বলছেন কিনা বুঝব কিভাবে?'

'তার মানে আপনি আমাকে সার্চ করতে চান, এই তো?'

ঠোঁট কামড়ে কি যেন চিন্তা করলেন ড. সিডাক। 'আপনি তাহলে আরও কিছুদিন বেলগ্রেডে থাকছেন?'

'না, আপাতত বেলগ্রেডে থাকছি না,' বলল রানা। 'ভাবছি মন্ট্রিনিগ্রোয় যাব একবার। পোডগোরিকায় কয়েকজন লেখক আছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করব। দেশটাও ঘুরে দেখা হবে।'

'গুলিটা ঠিক সময় মতই করেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ, মি. রানা।'

'ওটা লাকি শট ছিল,' বলল রানা। তারপর প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল ড. সিডাক এখানে এলেন কিভাবে।

পুলিস চীফ ব্যাখ্যা করলেন। কালো মার্সিডিজ রানার পিছু নিয়েছিল, এ-খবর নোভার কাছ থেকে পান তিনি। একটু খোঁজ করতেই পুলিস ওটার সন্ধান পেয়ে যায়। কালো লেদার জ্যাকেটকে আজ সারাটা দিনই অনুসরণ করেছে তারা। দুপুরের পর অবশ্য গাড়িটা হারিয়ে যায়। তবে এদিকে আসার পথেই হারায় সেটা। সিসটো, মিতসুবিসি জীপের ড্রাইভার, আন্দাজ করে সাঈদ মুর্তজায়েভের বাড়ির দিকেই এসেছে মার্সিডিজ। সেজন্যেই রাস্তা ব্লক করে অপেক্ষা করছিল সে। সিসটোর অনুমান ভুল হয়নি। তবে অনুমান সঠিক হওয়াতেই মরতে হয়েছে বেচারাকে।

সিটি শেরাটনের সামনে গাড়ি থামালেন ড. সিডাক। রানাকে বললেন, 'এখন তাহলে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই, তাই না?'

'না, নেই।'

'সেক্ষেত্রে সময় নষ্ট না করে অন্যান্য লেখক-সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের কাজটা সেরে ফেলতে পারেন আপনি। তালিকাটা আপনি নোভাকে দিলে, হেডকোয়ার্টার থেকে আমরা নির্দিষ্ট দিন-তারিখ স্থির করে দেব।'

'ঠিক আছে,' বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা।

স্যুইটে ফিরে ওয়ালথারটা রিলোড করল রানা। ড. সিডাকের ওপর নোভার প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। ওর হাতে ওয়ালথারটা দেখার পরও ওকে তিনি কোন প্রশ্ন করেননি।

শাওয়ার সেরে ইন্টারকমে কফির অর্ডার দিল রানা। দশ মিনিট পর দরজায় নক হলো। দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল জেমস ফোলি, তার

পিছনে বিলিয়ার্ড ও ওয়েটার।

সিটিংরুমে ঢুকেই ধপ করে একটা সোফায় বসে পড়ল ফোলি। তার কপালের পাশে চৌকো ও সাদা অ্যাডহেসিভ টেপ লাগানো রয়েছে। ওয়েটার ট্রে রেখে চলে যাবার পর রানা জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে আপনার?'

'আপনার শত্রু ওই দুইনম্বর জোডার সঙ্গে মতের মিল হয়নি,' বলল ফোলি, ব্যথায় মুখটা কুঁচকে রেখেছে। 'অফিশিয়ালি, একটা দরজার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছি।'

'পাহাড়ের ওপর তাহলে আপনিই ছিলেন?'

'আপনাকে নিয়ে ওদের ইঁদুর-বেড়াল খেলাটা আমি মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছি,' বলল ফোলি। 'এ উপলক্ষে ইচ্ছে করলে আপনি আমাকে হুইস্কি খাওয়াতে পারেন।'

'ফোলি, প্লীজ,' মৃদু তিরস্কারের সুরে বললেন বিলিয়ার্ড, একটা সোফার হাতলে বসেছেন তিনি। 'তুমি জানো মি. রানা ও-সব খান না।'

হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল ফোলি। 'ঠিক আছে, হুইস্কির বদলে কফিই হোক।'

'হেলপ ইওরসেলফ,' বলল রানা।

কিন্তু কফি পটের দিকে হাত না বাড়িয়ে ফোলি জিজ্ঞেস করল, 'ওটা আপনি এনেছেন?'

'কোন্‌টা?'

'মি. রানা, প্লীজ। আমি সাঈদ মুর্তজায়েভের পাণ্ডুলিপির কথা জানতে চাইছি।'

'উনি আমাকে কোন পাণ্ডুলিপি বা অন্য কিছু দেননি,' বলল রানা। 'তবে বলেছেন, কমপ্লিট হলে আমাকে জানাবেন।'

'কমপ্লিট হলে জানাবেন?' বিড় বিড় করল ফোলি। 'লেখাটা কি নিয়ে, কোন আভাস দিয়েছেন?'

'আভাস নয়, স্পষ্টই বলেছেন। পুরো বইটাই মার্কিনীদের বলকান নীতির বিরুদ্ধে লেখা।'

'তাহলে তো অবশ্যই ওই পাণ্ডুলিপি আমাকে পেতে হবে,' জেদের সুরে বলল ফোলি। 'আপনাকে কথা দিতে হবে, মি. রানা—পাওয়া মাত্র ওটা আপনি আমার হাতে তুলে দেবেন।'

'এতই যদি তাগাদা অনুভব করেন, যান না, সাঈদ মুর্তজায়েভের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনুন,' বলল রানা। 'আপনার আর কিছু বলার আছে? না থাকলে কফি খেয়ে দয়া করে বিদায় হন, আমার কাজ আছে।'

সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফোলি। 'আপনার কি এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধও নেই? মাত্র খানিক আগে আমি আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছি, এত তাড়াতাড়িই ভুলে গেলেন?'

'সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ,' বলল রানা। 'কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রাণ বাঁচিয়েছেন বলে অন্যায় আবদার করবেন? যান, বিদায় হোন।'

'আপনি আসছেন, মি. বিলিয়ার্ড?' দরজার দিকে পা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল

ফোলি।

'না, তুমি যাও, আমি পরে আসছি।'

ফোলি বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে দিল রানা।

'ওকে এভাবে অপমান না করলেও পারতেন আপনি, মি. রানা।' বিলিয়ার্ডকে চিন্তিত মনে হলো। 'পাণ্ডুলিপিটা পেলে সে হয়তো আপনাকে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগটা ব্যবহার করতে দিত।'

রানা বলল, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনাদের কারও কোন সাহায্য আমি নেব না।'

'ডকুমেন্টটা তাহলে কিভাবে নিয়ে যাবেন?'

'আগে সেটা পাই, তারপর ভেবে দেখব।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'দানিয়ুবের কাছে সাকায়েভ নামে একটা রেস্তোরাঁ আছে, চেনেন আপনি?'

'হ্যাঁ, চিনি। কেন?'

'ভাবছিলাম, জায়গাটা কেমন। ওখানে আমার একটা ডিনার ডেট আছে।'

'অভিজাত রেস্তোরাঁ, এলিটরাই খাওয়াদাওয়া করে ওখানে। আপনাকে আমি দেরি করিয়ে দিচ্ছি না তো?'

'না, একটু পরে বেরুলেও চলবে।'

'বাইরে আমার গাড়ি আছে,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই। যাবার পথে দু'চারটে কথাও বলব।'

বিলিয়ার্ড আজ ঝকঝকে একটা পাজেরো নিয়ে এসেছেন। নিজেই ড্রাইভ করছেন তিনি। 'ড. সিডাক আপনার বক্তব্য শান্তভাবে মেনে নিলেন, মি. রানা? আপনাকে নিশ্চয়ই তিনি সার্চ করেছেন?'

'সবাই ফোলির মত অভদ্র নয়,' বলল রানা।

'পাণ্ডুলিপি কমপ্লিট হয়নি, ভাল কথা। কিন্তু ডকুমেন্টটা?'

'ডকুমেন্ট সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি।'

'সম্ভবত পাণ্ডুলিপির সঙ্গেই ওটা আপনাকে দেবেন তিনি।'

'দিলেই বা কি। আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে।'

'হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই। সেজন্যেই বলছি, আপনি ফোলির সাহায্য নিতে আপত্তি করছেন কেন? আপনার বোধহয় ভয়, পাণ্ডুলিপিটা দিলে ফোলি সেটা নষ্ট করে ফেলবে। সেক্ষেত্রে মূল পাণ্ডুলিপি নিজের কাছে রেখে, ফটোস্ট্যাট করা একটা কপি দিলেও তো পারেন।'

রানা হেসে উঠল। 'আপনার কি ধারণা, তাতে সে সন্তুষ্ট হবে?'

'আপনি রাজি থাকলে আমি তাকে বলে দেখতে পারি। বিনিময়ে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগটা ব্যবহারের সুযোগ দিতে বলব।'

কথা না বলে চুপ করে থাকল রানা।

'মি. মুর্তজায়েভ আমার বা নোডা সম্পর্কে কিছু বললেন?' জিজ্ঞেস করলেন বিলিয়ার্ড।

'হ্যাঁ, অনেক কথাই বললেন। আপনি একবার তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। নোডাকে তিনি আপনার মাধ্যমেই সাহায্য করেন। আচ্ছা, নিকোলাই সুনজাককে

যে মুর্তজায়েভ খুন করেননি, এ তো আপনি প্রথম থেকেই জানেন, তাই না? তাহলে নোভার ভুল ধারণাটা ভেঙে দেননি কেন?'

'নোভার মাকে কথাটা আমি অনেক বারই বলার চেষ্টা করেছিলাম,' বিলিয়ার্ড বললেন। 'কিন্তু কোন লাভ হয়নি। মুর্তজায়েভের নাম পর্যন্ত শুনতে চাইত না সে। আসলে যে পরিস্থিতিতে সুনজাক খুন হয়, খুনী হিসেবে মুর্তজায়েভকেই সবাই সন্দেহ করত। নোভা তখন ছোট ছিল, কাজেই তাকে বলার সুযোগ ছিল না। সে বড় হবার পরও বলিনি, কারণ সে-ও তার মায়ের মত মুর্তজায়েভের নাম পর্যন্ত শুনতে চায় না। তাছাড়া, আমরা কেউই ওই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী নই।'

সাকায়েভের সামনে গাড়ি থামালেন বিলিয়ার্ড। রানা বলল, 'আপনার কৌতূহল হচ্ছে না, কার সঙ্গে আমি ডিনার খেতে যাচ্ছি?'

মুচকি হেসে বিলিয়ার্ড বললেন, 'আমি জানি। ফোনে নোভার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা।

রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই হেড ওয়েটার সরাসরি ওর দিকে এগিয়ে এল। 'মি. মাসুদ রানা?' রানা মাথা ঝাঁকাতে হাসল। 'আমার সঙ্গে আসুন, স্যার।' আগেই বলে রেখেছিল নোভা, রানাকে পর্দা ঘেরা একটা কেবিনে পৌঁছে দিল সে।

উদ্বেগ আর উত্তেজনায় কাহিল হয়ে পড়েছে নোভা। রানাকে দেখে প্রথমে সে কোন কথাই বলতে পারল না। তারপর, রানাকে বিব্রত ও বিহ্বল করে দিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। 'ওহ্ গড! কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব...ওহ্ গড! আমি ধরেই নিয়েছিলাম ওরা তোমাকে...'

নোভার কাঁধে একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিল রানা। 'শান্ত হও, মিষ্টি মেয়ে।' রুমালটা তার হাতে গুঁজে দিল। 'তুমি আমার ভাল চাও, এই বোধটাই আমাকে শক্তি এনে দিচ্ছে–ফলে ওরা আমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।' বেল বাজিয়ে ওয়েটারকে ডাকল ও। 'কি খাবে তাড়াতাড়ি বলো, আমার নাড়ীভুঁড়ি সব জ্বলছে।'

আট

ড. সিডাক তাঁর কথা রাখলেন। পরদিন রানার ব্রেকফাস্ট টেবিলে পৌঁছে গেল খামে ভরা শেডিউল। কোন্ লেখকের সঙ্গে কোথায় কবে দেখা হবে, সবই তাতে বিস্তারিত লেখা আছে, লেখক সংঘকে দেয়া পুলিসের অনুমতি-পত্র সহ। শেডিউল পড়ে রানা জানতে পারল, আগামী পনেরো দিন পাঁচটা শহরে ঘুরে বেড়াতে হবে ওকে, কিন্তু এগুলোর মধ্যে মন্ট্রিনিগ্রোর কোন শহর নেই। খামে ছোট্ট একটা চিরকুটও পাওয়া গেল, তাতে ড. সিডাক রানাকে পরামর্শ দিয়ে লিখেছেন–দোভাষী হিসেবে লিলিয়ান নোভা ওর সঙ্গে থাকলে ভাল হয়, কারণ বেশিরভাগ লেখক-সাহিত্যিকই ইংরেজি বা অন্য কোন বিদেশী ভাষা জানেন না।

তাছাড়া, ওর একজন গাইডও দরকার হবে।

কিছুক্ষণ পর ফোন করে নোভা ওকে জানাল, শেডিউলের একটা কপি সে-ও পেয়েছে। রানাকে তৈরি থাকতে বলল, আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে ওকে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাবে–প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ওখানেই।

ছোট একটা ফিয়াট নিয়ে ঠিক আধ ঘণ্টা পরই পৌঁছাল সে। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা, রোগা বলা যাবে না, হালকা নীল রঙের টুইড সুটটা দারুণ মানিয়েছে। রওনা হবার পর রানা লক্ষ করল, একটা কার অনুসরণ করছে ওদেরকে, ড্রাইভার ছাড়াও পিছনে বসে আছে ইউনিফর্ম পরা দু'জন পুলিস।

সেদিনই বিকেলে হোটেলে ফেরার সময় একটা ইংরেজি দৈনিক কিনে রানার হাতে ধরিয়ে দিল নোভা। খবরটা প্রথম পাতাতেই বেরিয়েছে। হেডিং-এ বলা হয়েছে–চুরি যাওয়া গোপন রাষ্ট্রীয় দলিল উদ্ধারে বাধা দেয়ায় পুলিসের হাতে যুবনেতা সেরোনোভিচ খুন!

খবরটা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলল রানা। রাস্তার ওপর যার ঘাড়ে ড. সিডাক লোহার রড গাঁথেন, সে-ই যুবনেতা সেরোনোভিচ। পুলিসের হেডকোয়ার্টার থেকে দেয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নির্জন পাহাড়ী রাস্তায় চুরি যাওয়া গোপন দলিল পুনরুদ্ধারের জন্যে ফাঁদ পেতে ছিল পুলিস। ওই রাস্তা দিয়ে একজন বিদেশী লোকের আসার কথা ছিল, যার কাছে গোপন দলিলটা থাকার কথা। যেভাবেই হোক, এই খবর সিক্রেট পুলিসের পলিটিক্যাল ক্রাইম সেকশন থেকে ফাঁস হয়ে যায়। পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেরোনোভিচ ওই রাস্তায় ওত পেতে ছিল। বিদেশী লোকটার গাড়ি থামিয়ে দলিলটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করে সে। গোলাগুলি শুরু হবার পর পুলিস সেখানে পৌঁছায়। হাতেনাতে ধরা পড়ে যাচ্ছে দেখে পুলিসকে গুলি করে সেরোনোভিচ, ফলে পুলিস আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি করতে বাধ্য হয়। মারা যাবার আগে সেরোনোভিচ স্বীকার করেছে, দলিলটা বিদেশী এক দূতাবাসে বিক্রি করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। পুলিস অবশ্য দলিলটা উদ্ধার করতে পারেনি। বিদেশী লোকটার সঙ্গে আরও একজন লোক ছিল, ধারণা করা হচ্ছে দলিলটা নিয়ে পালিয়েছে সে।

পরবর্তী দুই হপ্তা কাজের মধ্যে ডুবে থাকল ওরা। আশপাশে কেউ না থাকলে ওকে রানা বলে ডাকে নোভা, অন্যান্য সময় মি. রানা বলে। তার সঙ্গে লেখক সংঘের অফিসে গেল রানা, গেল বিভিন্ন লেখকদের ভিলা ও ম্যানসনে। কখনও ফিয়াট ব্যবহার করল ওরা, কখনও রেন্ট-আ-কার থেকে ভাড়া করা মার্সিডিজ। বেলগ্রেডের বাইরে যাবার সময় প্লেনেও চড়তে হলো। ব্যক্তিগত সম্পর্কটাকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলার কোন চেষ্টাই ওদের কারও মধ্যে দেখা গেল না। হোটেলে আলাদা কামরায় থাকল, কাজের ফাঁকে অবসর সময় কাটাল চিত্র-প্রদর্শনী বা নাটক দেখে। একবার একটা কনসার্টেও গেল।

নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ নোভা। লেখক-সাহিত্যিকরা সবাই তাকে চেনেন, বয়েসে ছোট হলেও তাঁরা তাকে সমীহের দৃষ্টিতেই দেখেন।

বেলগ্রেডে থাকুক বা অন্য কোন শহরে যাক, ওদের সঙ্গে সব সময় ছায়ার মত লেগে থাকল দু'জন সশস্ত্র পুলিস। ব্যাপারটা রানার মাথাব্যথার কারণ হয়ে

দাঁড়াল। পোডগোরিকা হয়ে কোটর আর বাডভায় যেতে হলে নোভার সঙ্গেই যেতে হবে ওকে। কিন্তু সেখানেও যদি ওদের সঙ্গে পুলিস থাকে, তাহলে তো বিরাট সমস্যা। পুলিস দেখলে মুর্তজায়েভের আত্মীয় হয়তো রানার ধারেকাছেও ঘেঁষতে সাহস পাবে না।

সমস্যা আরও একটা আছে। মন্ট্রিনিগ্রোয় বেড়াতে যাবার কথাটা এরই মধ্যে ড. সিডাককে একবার বলেছে রানা। আবার যদি নোভাকে বলে, ওদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। ও চাইছে, ওখানে বেড়াতে যাবার প্রস্তাবটা নোভার তরফ থেকেই আসুক।

তারপর রানা টের পেল, শুধু পুলিস নয়, দূর থেকে আরও কেউ ওদেরকে চোখে চোখে রাখছে। বারবার গাড়ি বদল করায় তাদের কাউকে স্পষ্ট ভাবে দেখতে বা চিনতে পারা গেল না। ফলে ওদের পরিচয় সম্পর্কে রানার সংশয়টাও থেকে গেল। কার্চিক জোডা বা তার প্রতিনিধি হতে পারে। আবার জেমস ফোলির ইনফরমার হওয়াও বিচিত্র নয়।

দেখতে দেখতে দু'হপ্তা পার হয়ে গেল। নোভি শাদ থেকে প্লেনে চড়ে বেলগ্রেডে ফিরে এল ওরা। এয়ারপোর্টে নেমে অ্যারাইভাল লাউঞ্জে লাগেজ আসার অপেক্ষায় রয়েছে রানা, একটু আসছি বলে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল নোভা। ফিরল বেশ অনেকক্ষণ পর, হাতে একটা দৈনিক। আঙুল দিয়ে খবরটা রানাকে দেখিয়ে দিল সে।

পড়তে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে এল রানার। ওর বেলগ্রেড অ্যাসাইনমেন্ট ব্যর্থ হতে চলেছে, এ তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত। খবরে বলা হয়েছে, প্রখ্যাত রাজনীতিক ও দার্শনিক সাঈদ মুর্তজায়েভ হঠাৎ করে অসুস্থ বোধ করায় সরকার একটা মেডিকেল বোর্ড গঠন করেছেন। বোর্ড মুর্তজায়েভকে পরীক্ষা করে জানিয়েছে, তিনি নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার। বহুবছর গৃহবন্দী অবস্থায় আছেন, এটাকেই কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বোর্ড সুপারিশ করেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাঈদ মুর্তজায়েভকে মানসিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা দরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, তাঁরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন।

খবরটা পড়ে রানা কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল। নোভাও কিছু বলল না।

ট্যাক্সি নিয়ে শহরে ফিরল ওরা। নোভার অনুরোধে তার ফ্ল্যাটে এল রানা। ওকে নিজের বেডরুমে বসিয়ে ভেতরে চলে গেল সে, ফিরে এল কফি নিয়ে। একটু পরই ফোনটা বেজে উঠল। দু'একটা কথা বলে রিসিভারটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল নোভা। 'তোমার ফোন, সিডাক আঙ্কেল কথা বলবেন।'

রিসিভার নিয়ে রানা বলল, 'বলুন, মি. সিডাক।'

'সব খবর ভাল তো, মি. রানা?' পুলিস চীফ জানতে চাইলেন। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বললেন, 'নোভা বলল, বেচারি মি. মুর্তজায়েভের অসুস্থতা সম্পর্কে খবরটা আপনি পড়েছেন। সত্যি, খুবই দুঃখজনক।'

'হ্যাঁ, খবরটা পড়েছি,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'কিন্তু বোধগম্য হয়নি, মি. সিডাক। সাঈদ মুর্তজায়েভ আমার বা আপনার চেয়ে বেশি অসুস্থ নন। তাঁকে

আপনারা ষড়যন্ত্র করে পাগলা-গারদে পাঠাতে চাইছেন।'

'আপনি চান আমরা যেন তাঁকে মেন্টাল হসপিটালে না পাঠাই?'

'আমি চাওয়ার বা না চাওয়ার কে?' বলল রানা। 'তবে আমি যতটুকু বুঝি, তাঁকে পাগলা-গারদে পাঠালে আপনাদেরই ক্ষতি।'

'কি রকম?'

'ডকুমেন্টটা যদি সত্যিই মি. মুর্তজায়েভের কাছে থাকে,' বলল রানা, 'নিশ্চয়ই গোপন কোন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন তিনি। তাঁকে পাগলা-গারদে পাঠালে সেটা ফিরে পাবার আশা আপনাদেরকে ত্যাগ করতে হবে।'

'সরকার এখুনি তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠাচ্ছে না,' পুলিস চীফ বললেন। 'ওখানে পাঠাবার কথা বলে তাঁকে আসলে তাগাদা দেয়া হচ্ছে–তিনি যাতে তাড়াতাড়ি ডকুমেন্ট আর পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে তুলে দেন।'

'ভুলে যাবেন না, তিনি সময় চেয়েছেন,' বলল রানা। 'আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে একটা পরিবেশ তৈরি করেছি, ফলে আমার হাতে ডকুমেন্টটা তুলে দিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছেন তিনি। এখন যদি খোঁচাখুঁচি করা হয়, পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ভয় পেয়ে তিনি হয়তো আর কারও হাতে তুলে দেবেন ওগুলো। আপনারা কি তাই চান?'

'আর কারও হাতে কিভাবে তুলে দেবেন?' জিজ্ঞেস করলেন ড. সিডাক। 'এখন থেকে আমরা তাঁর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দিচ্ছি না।'

'আপনি বলতে চাইছেন এ-দেশের মানুষ ঘুষ খায় না? তাছাড়া, ওগুলো যে তাঁর বাড়িতেই আছে, কে বলল আপনাকে? হয়তো অন্য কোথাও অন্য কারও কাছে আছে, নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর তিনি ফেরত না চাইলে সেই লোক হয়তো বিদেশী কোন দূতাবাসে দিয়ে আসবে।'

অপরপ্রান্তে চুপ করে আছেন ড. সিডাক। সন্দেহ নেই, চিন্তায় পড়ে গেছেন তিনি।

রানা আবার বলল, 'আমার মতে, ওনাকে আরও কিছু দিন সময় দেয়া দরকার। তিনি যখন আমাকে ডাকবেন, ইচ্ছে করলে আপনিও আমার সঙ্গে যেতে পারেন।'

'আমি গেলে কি ডকুমেন্টটা দেবেন তিনি?' পুলিস চীফের গলায় সন্দেহ।

'মি. মুর্তজায়েভ ভাল করেই জানেন যে ডকুমেন্টটা আমার হাতে তুলে দিলেও আমি সেটা যুগোস্লাভিয়া থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারব না,' বলল রানা। 'যদি দেন, সরকারকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যেই দেবেন। আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনি আমার সঙ্গে থাকলে আমাকে না দিয়ে আপনাকেই দেবেন তিনি। হাজার হোক, এক সময় আপনারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।'

রানার কথায় যুক্তি খুঁজে পেলেন ড. সিডাক। হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, 'শুধু কি বন্ধু ছিলাম! আত্মীয়-স্বজন আর প্রতিবেশীরা বলত, আমরা নাকি যমজ ভাই...'

'হ্যাঁ, বলারই কথা!' হাসিটা চেপে রাখল রানা। 'এখন তাহলে রাখি,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল ও।

ওকে ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বলে কিছুক্ষণ আগে বাথরুমে শাওয়ার নিতে

গেছে নোভা। কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে দেখল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত প্রায় ধ্যানমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করছে। তারপর নিঃশব্দে হাসল আপনমনে। বিছানা থেকে নিজের সুটকেসটা তুলে দরজার দিকে এগোবার সময় ভাবল, বিচ্ছেদের ভাব সৃষ্টি করার জন্যে সামান্য নাটকীয়তার আশ্রয় নিলে ক্ষতি নেই। আশা করা যায় নোভা ওর আচরণে অস্থির হয়ে উঠবে।

দরজা খুলে নিঃশব্দে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল রানা। নিচে যথারীতি পাহারা দিচ্ছে গার্ডরা, তবে ওকে কিছু বলল না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরল ও।

শাওয়ার সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে, ফোনটা ঝন ঝন করে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নয়, বেশ কিছুক্ষণ পর রিসিভার তুলল রানা। 'হ্যাঁ, বলো নোভা।'

'তুমি এভাবে চলে গেলে কেন?'

রানা কথা বলছে না।

'রানা?' দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করল নোভা। তারপর ব্যাকুল গলায় জানতে চাইল, 'কি হয়েছে তোমার? আমার কোন কথায় বা আচরণে দুঃখ পেয়েছ?'

'না।'

'তাহলে? আমাকে কিছু না বলে তুমি চলে গেলে কেন?'

'আমাকে তুমি ক্ষমা করো, নোভা,' ম্লান গলায় বলল রানা। 'জানি কাজটা উচিত হয়নি, তবে হঠাৎ উপলব্ধি করলাম তোমার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে থাকাই সবদিক থেকে ভাল।'

'কিন্তু কেন?' নোভার গলায় শুধু উদ্বেগ নয়, কাতর অভিমানের সুরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'কেন, তুমি বুঝতে পারো না? সুন্দরী একটা মেয়ের সঙ্গে একটানা পনেরো দিন কাটালাম। তার অতীত বর্তমান সব জানলাম। তার স্বভাব, অভ্যাস, রুচি, বুদ্ধি, সরলতা, কোমলতা যত দেখলাম ততই মুগ্ধ হলাম। শুরু হলো নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। যুদ্ধও বলা যায়। নিজেকে সন্ন্যাসী করে রাখার কঠিন সাধনা। পনেরোটা দিন কম সময় নয়, নোভা। আমি নিজেকে সংযম হারাতে দিইনি। কিন্তু আমিও তো রক্ত-মাংসের মানুষ, বলো? সংযম পালনের আমারও তো একটা সীমা আছে। যখন বুঝতে পারলাম, আমার দ্বারা তোমার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, সিদ্ধান্ত নিলাম দূরে সরে থাকব...'

'ওহ্ গড! ঠিক যা ভেবেছি! প্লীজ, রানা, প্লীজ—আমার কথা শোনো। তুমি যে কতটা ভদ্র, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সে-কথা বলার জন্যে এয়ারপোর্ট থেকে আমার ফ্ল্যাটে আনি তোমাকে। কেন ভাবছ আমার ক্ষতি হয়ে যাবে...'

'নিজেকে চিনি, নোভা,' শান্ত গাম্ভীর্যের সুরে বলল রানা। 'তাই কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। দুঃখিত। পারলে আমাকে ক্ষমা কোরো।' নোভাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল ও।

ঘটনাটা ঘটাবার পর এখন রানা উপলব্ধি করছে, নোভার প্রতি সত্যি সত্যি দুর্বল হয়ে পড়েছে ও। যাকে অসম্ভব ভাল লাগছে, স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষে তার সঙ্গে চালাকি করা শুধু অরুচিকর নয়, এক হিসেবে নীচতাই। তবে এই মুহূর্তে অন্য

কোন উপায়ও তো নেই ওর। পরে নাহয় সময় মত ক্ষমা চেয়ে নেবে।

তারপর নিজেকে রানা স্মরণ করিয়ে দিল, শুধু ক্ষমা চাইলেই হবে না। কারণ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে।

অ্যাসাইনমেন্টটা সফল করতে হলে নোভার সাহায্য একান্ত দরকার রানার। কিন্তু নোভা ওকে সাহায্য করেছে, এ-কথা জানাজানি হয়ে গেলে সিক্রেট পুলিস ও যুগোস্লাভিয়া সরকার ওকে ছাড়বে না। কাজেই নোভার সাহায্যও পেতে হবে, আবার শত্রুদের বোঝাবারও ব্যবস্থা করতে হবে যে সে কোন অপরাধ করেনি।

কিন্তু তা কি সম্ভব? এর উত্তর একমাত্র সময়ই বলে দেবে।

পরবর্তী তিনদিন নিজেকে হোটেলে বন্দী করে রাখল রানা। প্রতিদিন দশ-বারোটা ফোন এল, কিন্তু একটাও ধরল না ও। হোটেল ম্যানেজমেন্টকে বলা ছিল, দিন শেষে ঠিকই জানতে পারল রানাকে কে কতবার ফোন করেছে। তিন দিনে পঁচিশ বার ফোন করেছে নোভা। ছ'বার করেছেন বিলিয়ার্ড।

নোভা শুধু ফোন করেনি, ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে হোটেলেও এসেছে তিন দিনে তিনবার। কিন্তু নিচের লাউঞ্জ থেকেই তাকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে মি. রানা কোন ভিজিটরের সঙ্গে দেখা করতে রাজি নন।

তিন দিন পর আজ রানার মনে সংশয় জাগছে, কৌশলটা আদৌ কি কোন কাজে লাগবে? এ যেন নিজেকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছে ও। রানার ধারণা, ওর সান্নিধ্য পাবার জন্যে এতটাই ব্যাকুল হয়ে উঠবে নোভা, নিজেকে ওর হাতে তুলে দিতেও কোন বাধা অনুভব করবে না সে। নিজেকে নিয়ে রানার এই অহঙ্কার বরাবরই ছিল, অনেক কাল সুপ্ত থাকার পর হঠাৎ করে মাথাচাড়া দিয়েছে। নিজের সম্পর্কে দৃঢ় একটা বিশ্বাস, যে মেয়ে ওকে একবার চিনেছে তার পক্ষে ওর আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

সত্যিই কি তাই?

গভীর রাতে হঠাৎ রানার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলার আগে বালিশের তলায় হাত দিল ও। ওয়ালথারটা ঠিক জায়গাতেই আছে। ঘুমটা হঠাৎ ভাঙল কেন? ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠল। ও, আচ্ছা, তাহলে বোধহয় ফোনের আওয়াজেই ঘুম ভেঙেছে। রিস্টওয়াচের আলো জ্বেলে ডায়ালে চোখ রাখল রানা। রাত আড়াইটা। এত রাতে কে হতে পারে? নোভা?

কি একটা উত্তেজনায় রানার মুখ গরম হয়ে উঠল। তাহলে কি ওর আশা পূরণ হতে যাচ্ছে? দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে মুক্ত বিহঙ্গ হতে চাইছে নোভা? টেবিল ল্যাম্পটা ইচ্ছে করেই জ্বালল না ও। হাত বাড়িয়ে ক্রেডল থেকে রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকাল। 'হ্যালো?'

অপরপ্রান্তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে নোভা। নিজেকে অপরাধী মনে হলো রানার। মনে মনে গাল দিল নিজেকে, 'ব্যাটা বদমাশ!' এ-ও ইচ্ছে হলো—সব কথা স্বীকার করে নোভাকে বলবে, তোমার যে-কোন শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব। 'কাঁদছ কেন?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

নোভা জবাব দিল না। তার কান্না যেন আরও বেড়ে গেল।

'তুমি যদি এভাবে কাঁদতে থাকো, নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব? কি হয়েছে বলো আমাকে, নোভা। তিন দিন কেটে গেছে, এখন আমি শান্ত-জোর দিয়েই বলতে পারি, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছি। আমি বলতে চাইছি, আবার আমাদের দেখা হতে পারে।'

'তুমি নিষ্ঠুর...' ধরা গলায় বলল নোভা। 'তোমার মধ্যে দয়ামায়া বলতে কিচ্ছু নেই।'

'অভিযোগ মিথ্যে নয়,' বলল রানা। 'কিন্তু এ-ও তোমাকে বুঝতে হবে যে আমি যদি নিষ্ঠুর হয়ে থাকি, সেটা তোমার ভালর জন্যেই।'

'আমার ভাল কে চাইতে বলেছে তোমাকে?' অভিমান উথলে উঠল নোভার গলায়। 'আমার ক্ষতি হয়ে যাবে, এই অজুহাত দেখিয়ে আমাকে তুমি এড়িয়ে থাকছ। আসল কথা তা নয়। আসল কথা হলো, আমার প্রতি তোমার কোন ফিলিংসই নেই।'

'না, নোভা, তুমিও জানো কথাটা সত্যি নয়,' প্রতিবাদ করল রানা।

'সত্যি নয়? কি করে বুঝব সত্যি নয়? তুমি যদি আমার মনের অবস্থা বুঝতেই, তাহলে এভাবে এত কষ্ট দিতে পারতে না। ফোন ধরেছ ঠিকই, কিন্তু ধরেই প্রথমে জানিয়ে দিলে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছ। এ-কথা বলে তুমি আমাকে অপমান করছ। এটাও যে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখার নতুন আরেকটা কৌশল, ভেবেছ এটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার নেই? তুমি সত্যি একটা পাষাণ, রানা। তোমাকে চিনতে আমি ভুল করেছি...'

'নোভা, প্লীজ...'

'আমাকে বলতে দাও, রানা। বলেছ, আমার ক্ষতি। আমার কি ক্ষতি, ব্যাখ্যা করতে পারবে? যদি বলি যে ক্ষতির কথা তুমি ভাবছ আমি এখন নিজেই চাইছি আমার ওই ক্ষতিটা হোক?'

রানা বিহ্বল।

'আমি নিজেই চাইছি, রানা। সত্যি চাইছি। আমার ওই ক্ষতিটা করো তুমি। আমরা বড় হয়েছি তো, নাকি? কি, কথা বলছ না কেন? আমাকে এড়াবার নতুন কোন অজুহাত খুঁজছ বুঝি? কোন লাভ হবে না, রানা। তুমি নিজের তৈরি ফাঁদে নিজেই ধরা পড়ে গেছ। শোনো, আমি কি চাই বলি। শুনছ তো?'

'হ্যাঁ, নোভা, শুনছি। সত্যি কথা বলতে কি, এখন আর কিছুই তোমাকে আমার বলার নেই। শুধু শুনেই যাব। বলো কি বলবে।'

'আমি চাই তুমি আমাকে দূরে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাও,' আবদারের সুর নোভার কণ্ঠে। 'এমন কোথাও, যেখানে শহরের কোলাহল নেই, পুলিসের নজরদারি নেই, কৌতূহলী মানুষের উঁকি-ঝুঁকি নেই...'

'সেরকম জায়গা কি আমি চিনি?' একটা ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তাহলে আমিই বলে দিই কোথায় আমাকে তুমি নিয়ে যাবে? কোটরে চলো। ওখানে আমাদের ফ্ল্যাট বাড়ি আছে। ছোট্ট শহর, কাছেই গভীর বনভূমি আর সাগর, আমার ক্ষতি করার জন্যে একেবারে আদর্শ জায়গা। এই শহরে সবাই আমার ভাল চাইছে, তাদের খবরদারিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি আমি। আমাকে তুমি

বাঁচাও, রানা, প্লীজ!'

নিজের কানকে রানা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছে ও।

'কি হলো, রানা? চুপ করে আছ কেন? তুমি যাবে না?'

'যাব। কিন্তু বেলগ্রেডের কাজ এখনও তো আমার শেষ হয়নি, তাই ভাবছি...'

'কি কাজ সে আমি জানি,' বলল নোভা। 'এক ভদ্রলোক তোমাকে ফোন করবেন, এই তো? করলে করবেন, কোটর থেকে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে তুমি।'

'ঠিক আছে, তাই হবে,' বলল রানা, বুঝতে পারছে রাজি হতে আর দেরি করা উচিত হবে না। 'কবে রওনা হতে চাও বলো।'

'প্রস্তুতি নিতে খুব বেশি সময় লাগবে না,' বলল নোভা। 'প্লেনের টিকিট আমিই কাটব। পরশু দিন যেতে চাই। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'মনে থাকে যেন, আমার ক্ষতি করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছ আমাকে!' এখন নোভার কথায় কান্না বা অভিমানের সুর নেই, থাকলে আছে সকৌতুক হুমকি। 'তা যদি না পারো, আমি কিন্তু তোমার ক্ষতি করতে ছাড়ব না!'

হাসতে গিয়ে রানা বুঝতে পারল, নার্ভাস হয়ে পড়েছে। 'তবে একটা কথা, নোভা। তুমি যখন চাইছই, তোমার ক্ষতি করতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার দুর্নাম হোক, এটা আমি চাই না।'

'মানে?'

'কোটরে আমি হোটেলে উঠব,' বলল রানা। 'কুমারী একটা মেয়ের সঙ্গে তার বাড়িতে রাত কাটানো আমার উচিত হবে না।'

'এ তোমার মাত্রা ছাড়ানো রক্ষণশীলতা নয় তো, মাসুদ রানা?' নোভার গলায় রাগ রাগ ভাব।

'তোমার কি লোকনিন্দার ভয় নেই?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'ঠিক আছে,' মেনে নেয়ার সুরে বলল নোভা। 'কিন্তু দিনের বেলা তোমাকে আমি সারাক্ষণ নিজের পাশে চাই।'

'জো হুকুম!' বলে ফোন ছেড়ে দিল রানা।

নয়

পডগোরিকা থেকে কোটরে যাচ্ছে ওরা। বাসে করে ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটারের রোমহর্ষক যাত্রা। জমিন থেকে তিন হাজার ফুট ওপরে পাহাড়ের গা কেটে অর্থাৎ কার্নিস চওড়া করে বানানো হয়েছে আঁকাবাঁকা রাস্তা, একপাশে গভীর খাদ, অন্যপাশে নিরেট পাহাড়-প্রাচীর। সময়টা দুপুর, কুয়াশা কেটে গেছে,

ফলে দূর থেকেও কোটর আর বাডভার নিবিড় বনভূমি দেখে রানার চোখ জুড়িয়ে গেল। ও ভাবছে, সীমাহীন ক্ষমতা মানুষকে অসম্ভব লোভীও করে তোলে, সেজন্যেই কোটর আর বাডভার মত বিশাল বনভূমি ব্যক্তিগত শখ মেটাবার উদ্দেশ্যে কিনে দখলে নিয়েছেন মিলোসেভিচ। আরও দূরে পারদের মত ঝলমল করতে দেখা গেল এড্রিয়্যাটিক সাগর।

ড্রাইভার খুব সাবধানে বাস চালাচ্ছে। দু'ঘণ্টা পর একটা বাঁক ঘুরতেই শহরটাকে দেখা গেল। কোটর বৃত্তাকার পাথুরে পাঁচিল দিয়ে সম্পূর্ণ ঘেরা। বিশাল দুর্গটার শুধু কাঠামোটাই কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে, অযত্ন-অবহেলায় বিধ্বস্ত-প্রায়। বৃত্তের বাইরে বনরক্ষীদের ছাউনি, খাকি ক্যানভাসের তৈরি বিশাল কয়েকটা তাঁবু। ছাউনির সামনে বাজার, সশস্ত্র বনরক্ষীরা ঘুরেফিরে কেনাকাটা করছে। কোটরের একমাত্র সরাইখানাটাও বৃত্তের বাইরে, চওড়া ও ভাঙাচোরা একটা রাস্তার ওপর। সরাইখানা ছাড়াও এই রাস্তায় দু'চারটে দোকান-পাট আছে, বেশিরভাগই মনোহারী। পাশাপাশি দুটো দোকানে আর্মস ও অ্যামিউনিশন সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

রানার প্রশ্ন শুনে নোভা জানাল, 'প্রেসিডেন্টের বন্ধু-বান্ধবরা বছরের যেকোন সময় কোটর আর বাডভায় শিকার করতে আসেন। সঙ্গে লাইসেন্স থাকলে দোকান থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র আর গোলাবারুদ কিনতে পারেন তাঁরা।'

তাঁবুগুলোকে ছাড়িয়ে এসে সরাইখানার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল বাস। পুরানো একটা দোতলা বাড়িকে সরাইখানা বানানো হয়েছে, ভার্নি লেখা তোবড়ানো সাইনবোর্ড কাত হয়ে আছে একদিকে, অক্ষরগুলো কোন রকমে পড়া গেল।

'এখানেই তোমাকে নামতে হবে,' রানাকে বলল নোভা।

চকলেট রঙের ব্রিফকেসটা ইঙ্গিতে দেখাল রানা। 'অসম্ভব ভারী ওটা, বাস থেকে নেমে বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারবে? আমি বরং তোমার সঙ্গে যাই···'

'খবর দেয়া আছে, পাঁচিলের গেটে বাস থামলে পরিচিত লোকজন অনেককেই দেখতে পাব,' বলল নোভা। 'তুমি বরং খাওয়াদাওয়া আর বিশ্রাম সেরে বিকেলে আমাদের বাড়িতে চলে এসো। প্লেনে চড়লে আমার কান ব্যথা করে, খানিকটা না ঘুমালে সারে না।' রানার হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল সে। 'এতে আমার ঠিকানা লেখা আছে, বাড়িটা চিনতে কোন অসুবিধে হবে না। ডুপ্লিকেট চাবিটাও রাখো।'

বাস থেকে নেমে যাচ্ছে রানা, পিছন থেকে নোভা আবার বলল, 'সরাইখানায় ওরা কিছু জিজ্ঞেস করলে আমার নাম বলবে, কেমন?'

সরাইখানার মালিক টুপি পরা এক বৃদ্ধ মুসলমান। খাতায় নাম লেখাবার জন্যে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'আপনি আমাদের লক্ষ্মীমেয়ে নোভা সোনার মেহমান, মাসুদ রানা, তাই না?'

রানা অবাক। 'আপনি জানলেন কিভাবে?'

দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসলেন বৃদ্ধ। 'ছোট্ট জায়গা, কে আসছে কে যাচ্ছে সব আমরা আগে থেকেই জানতে পারি। কোটরে ফোন আছে, নোভা তার বুড়ো দাদুকে ফোন করে আপনার জন্যে একটা কামরা খালি রাখতে বলে দিয়েছে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে দোতলায় নিজের কামরায় উঠে এল রানা। জানালার সামনে দাঁড়াতে পাঁচিল ঘেরা কোটর শহরটা দেখা গেল। পাঁচিল দেয়া ঘেরা বলেই সম্ভবত কোটরকে ছোট্ট শহর বলা হয়। এক সময় পাঁচিলের ভেতর শুধু দুর্গটাই ছিল। তারপর দুর্গের চারপাশে বেশ বড় একটা জায়গা জুড়ে লোকবসতি গড়ে উঠেছে, তবে তা-ও সম্ভবত কয়েকশো বছর আগের ঘটনা কারণ বাড়িঘর বেশিরভাগই প্রাচীন। পুরানো প্রতিটি দালান মুসলিম স্থাপত্য রীতির নিদর্শন বহন করছে। তবে একটা জিনিস দেখে অবাকই হলো রানা। শহরে অনেকগুলো চার্চ রয়েছে, কিন্তু মসজিদ নেই একটাও।

দোতলায় শুধু এই কামরাতেই সংলগ্ন বাথরুম আছে। তবে রুম-সার্ভিসের ব্যবস্থা নেই, নিচে নেমে ডাইনিং রুমে খেতে হবে। তার আগে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাবে রানা।

বাথরুমে ঢুকতেই এনভেলাপটা চোখে পড়ল। ওয়াশবেসিনের ওপর গ্লাস শেলফ, তার ওপর পড়ে আছে। এনভেলাপ ছিঁড়ে কাগজটা বের করল রানা। ইংরেজিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা হয়েছে–

'মাসুদ রানা,

এত বাধা দেয়া সত্ত্বেও গ্রাহ্য করলে না, সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে ঠিকই দেখা করলে। এবার তাহলে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকো। কথা দিয়েছিলাম পরের বার দেখা হলে তোমাকে আমি খুন করব, তবে পরিস্থিতির কারণে সফল হতে পারিনি। খুব শিগ্‌গির আবার আমাদের দেখা হবে, এবং এবার তোমাকে আমি ঠিকই খুন করব। আমার গায়ে টোকা দিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ বাঁচতে পারেনি।'

চিঠিতে প্রেরকের নাম নেই। তবে বোঝাই যাচ্ছে রানার পিছু নিয়ে কোটরেও পৌঁছে গেছে জর্জিক। বলা যায় না, হয়তো কার্চিক জোডা নিজেও পৌঁছে গেছে।

খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিল রানা। গেট পেরিয়ে যখন শহরে ঢুকল, সূর্য দিগন্ত ছুঁই-ছুঁই করছে। শহরের প্রতিটি রাস্তা পাথর দিয়ে বাঁধানো। একটাই চৌরাস্তা, লোকজনের বেশ ভিড়ও দেখা গেল। তবে পাঁচিলের ভেতর কোন দোকান-পাট নেই। গেটের একটা সাইনবোর্ডে বলা আছে, গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢোকা নিষেধ। রাস্তা ও বাড়ির দেয়াল একদম পরিষ্কার, কোথাও এতটুকু ধুলো নেই। এখানে সবাই সবাইকে চেনে, ফলে রানাকে দেখে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠল। তবে কেউ ওকে কোন প্রশ্ন করল না।

শহরটা একবার চক্কর দিল রানা। না, সত্যি কোন মসজিদ নেই। অথচ টুপি পরা বেশ ক'জন লোককে দেখা যাচ্ছে। মসজিদ না থাকার কি কারণ, নোভাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আবার চৌরাস্তায় ফিরে এল রানা। ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে, ওকে কেউ অনুসরণ করছে না।

দ্রুত কমে আসছে আলো। ইলেকট্রিসিটি আছে, তবে রাস্তায় কোন লাইটপোস্ট নেই। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে চৌরাস্তা থেকে সরু একটা গলিতে ঢুকল রানা। চৌরাস্তা বাদে, শহরের প্রতিটি গলিই অসম্ভব সরু–দু'হাত লম্বা

করলে দু'দিকের দেয়াল ছোঁয়া যাবে। প্রাচীন হলেও, প্রায় প্রতিটি দালান তিন-চারতলা উঁচু মুখ তুলে সরু এক ফালি ম্লান আকাশ দেখতে পেল রানা। বাড়িগুলোর ঝুল-বারান্দা থেকে লতানো গাছ নেমে এসেছে। বাতাসে ফুলের গন্ধ। এরই মধ্যে কোন কোন বাড়িতে আলো জ্বালা হয়েছে। কাছেই কেউ একজন গিটার বাজাচ্ছে। রেডিওর গানও শোনা গেল। আলোকিত একটা জানালা দিয়ে এক তরুণীকে নামাজ পড়তে দেখা গেল।

একটা বাঁক ঘুরল রানা। গলিটা নির্জন। মাথার ওপর ডানা ঝাপটাল এক দল কবুতর। পরমুহূর্তে, ঠিক ওর পিছনে, প্রচণ্ড শব্দে কি যেন একটা পড়ল উপর থেকে। লাফ দিয়ে একটা বাড়ির দোরগোড়ায় আশ্রয় নিল রানা, জ্যাকেটের ভেতর থেকে ওয়ালথারটা বেরিয়ে এসেছে হাতে। কিন্তু ওর পিছনে ফাঁকা গলি, কেউ নেই। পাথরের বেশ বড় একটা টুকরো, সম্ভবত কার্নিসের ভাঙা অংশ, কোন বাড়ির মাথা থেকে খসে পড়েছে নিচে। এক মুহূর্ত আগে যেখানে ছিল রানা, ঠিক সেখানেই পড়েছে ওটা। গলির দু'পাশের জানালা খুলে গেল, দোতলা আর তিনতলা থেকে লোকজন ঝুঁকে নিচে তাকাচ্ছে। অনেকেই প্রশ্ন করছে। আঞ্চলিক ভাষা, রানার বোঝার কথা নয়। একটু পরই উত্তেজনা থিতিয়ে এল। জানালাগুলো আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দোরগোড়া থেকে বেরিয়ে এসে পাথরের টুকরোটা পরীক্ষা করল রানা। তুলতে চেষ্টা করে পারল না, এতই ভারী। ওয়ালথারটা এখনও হাতে, মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল ও। ইতিমধ্যে অন্ধকার জাঁকিয়ে বসেছে। দেখা গেল না কাউকে।

ঠিকানা মিলিয়ে নোভাদের বাড়িটা খুঁজে নিল ও। চারতলা বাড়ি, নোভা তিনতলায় আছে। দরজায় নক করল ও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আরেকবার। কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

চাবি বের করে তালাটা খুলতে যাবে রানা, হাতের চাপ লাগায় দরজার কবাট ফাঁক হয়ে গেল। ওয়ালথারটা আবার বেরিয়ে এল হাতে। কবাট আরও ফাঁক করে নিঃশব্দ পায়ে ফ্ল্যাটে ঢুকল ও, অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে। দরজা বন্ধ করে সেটার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। ডান দিকে অন্ধকার, বাম দিকে অস্পষ্ট আলোর আভাস। সরু করিডর ধরে সাবধানে সেদিকে এগোল ও। সামনে একটা কামরা, উল্টোদিকের খোলা জানালা দিয়ে মেঝেতে চাঁদের আলো ঢুকেছে। এটা একটা স্টুডিও। বড় একটা ডেস্ক আছে, তাতে নিকোলাই সুনজাকের আরও একটা ব্রোঞ্জ মূর্তি দেখল রানা।

ছায়ার ভেতর থেকে লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে একজোড়া হিংস্র প্রাণী—একটা প্যান্থার ও একটা লেপার্ড। তারপর ওগুলোকে চিনতে পেরে পরম স্বস্তি অনুভব করল রানা। নোভার কালো সুটটা চেয়ারের পিঠে ঝুলছে, লেপার্ড-স্কিন কলার সহ বাতাসে দোল খাচ্ছে ওটা। চেয়ারটার সামনে বেশ বড় একটা স্টুডিও বেড, নীল ডোরা কাটা রোব পরে তাতে পাশ ফিরে শুয়ে আছে নোভা। অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে, পিছনে ছড়িয়ে আছে বিশাল এলো চুল। ওয়ালথারটা ডেস্কে রেখে নিঃশব্দে চেয়ারে বসল রানা, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নোভার চওড়া পিঠের ওঠা-নামা দেখছে।

যেন রানার উপস্থিতি টের পেয়েই একটু পর চোখ মেলল নোভা। চাঁদের অল্প আলোয় রানাকে চিনতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিল সে, তারপর কথা না বলে দু'হাত বাড়িয়ে দিল—ডাকছে ওকে।

জোছনা এক সময় উঠে এল বিছানার ওপর। আধ ঘণ্টারও বেশি হবে পরস্পরকে ছুঁয়ে শুয়ে আছে ওরা। অনেকক্ষণ কোন কথা হয়নি। রানার একটা হাত টেনে নিয়ে চুমো খেলো নোভা, তারপর ফিসফিস করে মাত্র দুটো শব্দ উচ্চারণ করল, 'আমি সুখী!'

ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার আর তার স্ত্রীকে বিদায় করে দিয়েছে নোভা, তার খুব শখ রানাকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে। কিচেনটা খুদে, রান্নার কাজে তাকে সাহায্য করল রানা। খাওয়া শেষ হতে হাতে কফির কাপ নিয়ে স্টুডিওতে ফিরেছে ওরা, এই সময় ফোনটা বেজে উঠল।

ড. সিডাক ফোন করেছেন। দু'এক মিনিট কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল নোভা, হঠাৎ করে আতঙ্কিত দেখাচ্ছে তাকে। রানা জানতে চাইল, 'কোন খারাপ খবর?'

'সিডাক আঙ্কেল বললেন, তাঁর লোকেরা কার্চিক জোডা আর তার ভাইকে কোটরের দিকে আসতে দেখেছে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি। সরাইখানায় তার ভাইয়ের একটা চিঠি পেয়েছি।' জ্যাকেটের পকেট থেকে চিঠিটা বের করে নোভার হাতে ধরিয়ে দিল ও।

চিঠিটা পড়ার পর ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল নোভা। 'এখন তাহলে কি করব আমরা?'

'ড. সিডাক কি বললেন?'

'উনি কয়েকজন বডিগার্ড পাঠাতে চাইছেন। কিন্তু আমি নিষেধ করেছি। বলেছি, আমাকে পাহারা না দিয়ে আপনার লোকদের বলুন তারা যেন জোডার ওপর নজর রাখে।'

মনে মনে খুশি হলো রানা। 'ভাল করেছ। বেড়াতে এসে যদি পিছনে বডিগার্ড নিয়ে ঘুরতে হয়, আনন্দটাই মাটি।'

'কিন্তু তোমার কথা ভেবে আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে। জোডা মানুষ নয়, পিশাচ। সে যেভাবে তোমার পিছনে লেগেছে...'

'কোন চিন্তা কোরো না, নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি,' বলল রানা। 'জোডা প্রসঙ্গ থাক। এসো, আমরা অন্য একটা জরুরী বিষয়ে কথা বলি।'

'জরুরী বিষয়?'

'হ্যাঁ। ড. সিডাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা তোমার কাছে গোপন করে গেছেন।'

'কি কথা?' ভুরু কোঁচকাল নোভা।

'তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও,' বলল রানা। 'তোমার বাবা নিকোলাই সুনজাককে সাঈদ মুর্তজায়েভ খুন করেছেন, একথা সত্যি নয়—তা কি তুমি জানো?'

'মানে?' হাঁ হয়ে গেল নোভা।

ধীরে ধীরে বলল রানা, 'গোটা ব্যাপারটাই ছিল ষড়যন্ত্র, নোভা। তোমার বাবাকে খুন করেছে কার্চিক জোডা। ম্যাক বিলিয়ার্ড জানেন। ড. সিডাকও জানেন। অবশ্য খুনটা হতে ওঁরা কেউ দেখেননি। তবে বিশ্বাস করেন, মুর্তজায়েভ নন, কার্চিক জোডাই খুনী।'

'শুধু বিশ্বাস করেন, কোন প্রমাণ ছাড়াই?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল নোভা। 'যেহেতু সবাই সাঈদ মুর্তজায়েভকেই খুনী বলে মনে করে, তাঁরই তো উচিত নিজেকে নির্দোষ বলে প্রমাণিত করা। তা কি তিনি পারবেন?'

'জোডাকে তিনি বলেছিলেন–সুনজাককে তুমিই খুন করেছ। উত্তরে শুধু হেসেছে জোডা, স্বীকার বা অস্বীকার কোনটাই করেনি। এই ঘটনার সাক্ষী হলো কয়েকজন পুলিস, তাদের মধ্যে অফিসারও ছিলেন দু'চারজন। জোডার ওই হাসি দেখে মুর্তজায়েভের মাথায় রক্ত চেপে যায়, তিনি জোডার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, তারই ছুরি কেড়ে নিয়ে পোঁচ দেন জোডার গলায়। ক্ষতটা শুকিয়ে গেছে, তবে দাগটা কোন দিন মুছবে না।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল নোভা। অনেকক্ষণ পর সে বলল, 'তুমি বললে সিডাক আঙ্কেল গুরুত্বপূর্ণ কি যেন একটা গোপন করে গেছেন আমার কাছে। কি?'

'তুমি আমাকে বলেছ, অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির প্রতি তুমি কৃতজ্ঞ। কারণ তিনিই তোমার লেখাপড়ার সমস্ত খরচ বহন করেছেন। ড. সিডাক তোমাকে শুধু জানিয়েছেন, তিনি তোমার বাবার একজন বন্ধু।'

'হ্যাঁ। তাঁর পরিচয় সিডাক আঙ্কেলও জানেন না।'

'না, কথাটা ঠিক নয়,' বলল রানা। 'ওই ব্যক্তির পরিচয় তিনি জানেন।'

'জানেন? কি বলছ!'

'হ্যাঁ। তিনি সাঈদ মুর্তজায়েভ। ম্যাক বিলিয়ার্ডের মাধ্যমে তিনিই তোমার লেখাপড়ার সমস্ত খরচ চালিয়েছেন। তোমার স্কলারশিপের ব্যবস্থাও তিনিই করেছিলেন। লন্ডনে তুমি লেখাপড়া করতে যাও, তা-ও মুর্তজায়েভের খরচে। এমন কি লেখক সংঘে যে চাকরিটা তুমি করছ, সেটাও তোমাকে পাইয়ে দিয়েছেন তিনিই।'

'রানা,' ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল নোভা। 'এ-সব কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, প্রতিটি শব্দ।'

বিছানা ছেড়ে উঠল নোভা, রানা কিছু বুঝতে পারার আগেই ওকে জড়িয়ে ধরল সে। রানা অনুভব করল, শরীরটা ঝাঁকি খাচ্ছে। ফোঁপাচ্ছে নোভা। কাঁদতে কাঁদতেই সে বলল, 'অথচ জানো, কয়েক বছর ধরে কি সাংঘাতিক একটা অপরাধবোধে ভুগছি আমি!'

'কেন?'

রানার কাঁধে চিবুক রেখে ফিসফিস করছে নোভা। 'তিনি আমার বাবার হত্যাকারী জানা সত্ত্বেও তাঁর লেখা আমার অসম্ভব ভাল লাগে, তাই। কাউকে দেখাইনি, তাঁর একটা কবিতার বই অনুবাদ করেছি আমি…'

হেসে উঠল রানা। 'তিনি তোমাকে ভালবাসেন, কারণ তুমি তাঁর বাল্যবন্ধুর

মেয়ে। তুমিও তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারোনি, কারণ আসলে তো তিনি তোমার বাবাকে খুন করেননি। প্রকৃতির প্রতিশোধ বলে যেমন একটা কথা আছে, তেমনি প্রকৃতির সুবিচার বলেও একটা কিছু আছে বৈকি…'

'বেলগ্রেডে ফিরে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। ভাবতেই নিজের ওপর ঘৃণা হচ্ছে, আমি তাঁকে চড় মেরেছিলাম। রানা, তিনি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন?'

'তুমি না চাইতেই তাঁর ক্ষমা পেয়ে গেছ, নোভা,' বলল রানা। 'তা না হলে এত বছর ধরে তিনি কি তোমাকে সাহায্য করতেন?'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নোভা রিস্টওয়াচে সময় দেখল। 'অনেক রাত হলো। চলো, গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিই তোমাকে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'কোন প্রয়োজন নেই। আমি একাই যেতে পারব। তুমি কিন্তু খুব সাবধানে থাকবে, কেমন? কেয়ারটেকার আর তার স্ত্রীকে ডেকে নাও, ফ্ল্যাটে একা থাকা তোমার উচিত হবে না। কোথায় ওরা? ভাল কথা, ব্রিফকেস থেকে লুগারটা বের করে নিজের কাছে রাখো।'

'ঠিক আছে। একতলার একটা কামরায় আছে ওরা। যাচ্ছ যাও, কিন্তু কাল সকালেই চলে আসবে, কেমন? তোমাকে নিয়ে ঘুরতে বেরুব।'

'ঠিক আছে।'

আঁকাবাঁকা সরু গলিগুলো চিনে রেখেছে রানা, সেই পথেই সরাইখানায় ফিরছে। কোটরে দশটাই অনেক রাত। রাস্তায় তো আলো নেইই, দালান-কোঠাগুলোও অন্ধকার হয়ে গেছে। পাথর বসানো পথে ওর জুতোর শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। ওর সামনে আড়াআড়িভাবে হঠাৎ রাস্তা পেরুল সাদা একটা বিড়াল, পরক্ষণে পিলে চমকে দিয়ে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল একটা পেঁচা।

শুধু প্রতিধ্বনি নয়, আরও একজোড়া পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে কয়েকবারই তাকাল, অন্ধকারে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। থামল ও, কান পেতে থাকল। পিছনের লোকটাও স্থির হয়ে গেছে। সে-ও রানাকে দেখতে পাচ্ছে না, ওর পদশব্দ অনুসরণ করছে।

এবার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা। একটা বাঁক ঘোরার পর বুঝতে পারল পিছনে কোন শব্দ হচ্ছে না। লোকটা কি হতাশ হয়ে থেমে গেছে? নাকি ঘুরপথে ওর সামনে চলে যাবার মতলব করেছে?

অন্ধকার এত গাঢ়, দেয়াল ধরে হাঁটতে হচ্ছে রানাকে। অকস্মাৎ খুট করে একটা আওয়াজ হলো পিছনে। রানা ঘুরতে শুরু করেছে, মস্ত একটা হাত ওর মুখ চেপে ধরল, আরেকটা হাত হ্যাঁচকা টান দিয়ে কেড়ে নিল ওয়ালথারটা। লোকটা ফিসফিস করল ওর কানে, 'সুনজাক আমার বন্ধু ছিল।' রানার মুখ থেকে হাত সরিয়ে একটা কব্জি চেপে ধরল সে। 'আসুন।' টান দিয়ে রানাকে গলির পাশের একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকাল। ঘরে আলো না জ্বললেও অন্ধকার নয়, পাশের ঘর থেকে আলোর আভা আসছে। লোকটা ওকে ছেড়ে দিল। তার শক্তির প্রমাণ আগেই পেয়েছে রানা, এবার প্রকাণ্ড কাঠামোটা দেখতে পেল। দৈত্য

বললেই হয়, তবে বয়স পঞ্চান্ন বা ষাটের কম নয়।

'আমি আলভিক সুজায়েভ, আলভিক নুরানিকের বাবা,' বলল লোকটা, হ্যান্ডশেক করার সময় রানার মনে হলো হাড়গুলো না ভেঙে যায়। 'খবরের কাগজে দেখলাম, মুর্তজায়েভের খুব বিপদ। তাকে পাগলা-গারদে পাঠাবার ষড়যন্ত্র চলছে। মি. রানা, এখানে আপনারও খুব বিপদ। শুধু আমরা নই, আরও অনেকে আপনাকে অনুসরণ করছে। কাজেই আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

'আপনি এত তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, এ আমি আশা করিনি,' ফিসফিস করল রানা।

'শত্রুরাও তা আশা করছে না,' সুজায়েভ বলল। 'সেজন্যেই যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

'কখন?'

'কাল রাতে।'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'যত তাড়াতাড়ি করা হবে ততই নিরাপদ। শুনুন, কি করতে হবে বলে দিচ্ছি। কাল ঠিক সন্ধের আগে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে বাডভার দিকে হেঁটে রওনা হবেন। দক্ষিণ-পুব দিকের পাকা রাস্তাটা ধরে পাহাড়ের দিকে যাবেন। ওই রাস্তায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

'কিন্তু আমাকে যদি অনুসরণ করা হয়?'

'সম্ভব হলে খসাবার চেষ্টা করবেন,' বলল সুজায়েভ। 'তবে এ-কাজে বেশি সময় নষ্ট করবেন না। একান্তই যদি ফেউ খসাতে না পারেন, তার বা তাদের ব্যবস্থা আমিই করব। দরজা খুলে দিচ্ছি, কোন শব্দ না করে বেরিয়ে যান। ভয় নেই, আশপাশে আমাদের লোক আছে।'

'একটা কথা,' ইতস্তত করে বলল রানা। 'আমার সঙ্গে যদি নোভা থাকে, সমস্যা হবে? তাকে আপনি চেনেন নিশ্চয়?'

মৃদু শব্দে হাসল সুজায়েভ। 'সুনজাক আমার বাল্যবন্ধু ছিল, তার মেয়েকে আমি চিনব না–ছোটবেলায় আমার কোলেই তো সে মানুষ হয়েছে! শুনুন, নোভা আপনার সঙ্গে থাকলে ভালই হয়। আমি যদি কোন কারণে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে না থাকি, ওই আপনাকে বাডভায় নিয়ে যেতে পারবে। ওকে বলবেন, বাডভায় ওদের খামারবাড়িতে যেতে হবে।'

'বাক্সটা কোথায় আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনাকে যদি না পাই, ওটা খুঁজে বের করব কিভাবে?'

'বাক্সটা এমন এক জায়গায় আছে, বলে দিলেও আপনারা খুঁজে পাবেন না। আমি রাস্তায় যদি থাকতে না পারি, নোভাদের খামারবাড়িতে ঠিকই থাকব, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। ওদের খামারবাড়িটা আমিই দেখাশোনা করি।'

'এখুনি নয়, দু'দিন থেকে এক হপ্তার মধ্যে কয়েকটা জিনিস দরকার আমার,' বলল রানা। 'ভেবেচিন্তে বলুন, জিনিসগুলো আপনি যোগাড় করতে পারবেন কিনা।'

'বলুন।'

তালিকাটা বেশ বড় হয়ে গেল। সবশেষে জানতে চাইল রানা, 'এ-সব আপনার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব?'

সুজায়েভ গম্ভীর। 'সম্ভব।'

'সেক্ষেত্রে লিখে নিন, তা না হলে ভুলে যাবেন।'

কাগজ-কলম নিয়ে এল সুজায়েভ। পেন্সিল টর্চের আলোয় লিখতে বসল। লেখা শেষ হতে রানা বলল, 'এ-সব যোগাড় করতে অনেক টাকা দরকার। আমার কাছে মাস্টার কার্ড আছে, হাজার দশেক মার্কিন ডলার দিতে পারব। কিন্তু সেটা ভাঙাতে হলে আপনাকে বড় কোন শহরে যেতে হবে। তাই বলছি, খরচটা আপাতত আপনি করলেই ভাল হয়। কিংবা যদি বাকিতে করাতে পারেন।'

তালিকার ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে সুজায়েভ বলল, 'দশ হাজার ডলার? নাহ্, অত টাকা লাগবে না। আশা করি পাঁচ হাজার ডলারেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।'

'গুড। এবার বলুন, কোটর ও বাডভা জুড়ে মিলোসেভিচের রিজার্ভ আর সৈকত সহ উপকূলের একটা ম্যাপ এঁকে দেয়া সম্ভব কিনা। গোটা এলাকাটা আপনি তো ভাল করেই চেনেন, তাই না?'

'এখনই দরকার?'

'না, কাল হলেও চলবে।'

'ঠিক আছে, পাবেন।'

'এবার তাহলে দরজাটা খুলুন, আমি বেরিয়ে যাই।'

দশ

পরদিন সূর্য ওঠার আগে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে শহরে ঢুকল রানা। চৌরাস্তার দিকে না গিয়ে পাঁচিলের গা ঘেঁষে অলস পায়ে হাঁটছে ও। মাত্র ভোর হয়েছে, রাস্তায় লাঠি হাতে কয়েকজন বৃদ্ধকেই শুধু দেখা গেল, মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন।

দুর্গটার জানালা-দরজা অনেক আগেই লোপাট হয়ে গেছে, গায়ে অসংখ্য গর্ত আর ফাটল, তবু ছাল ছাড়ানো কাঠামোটা এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের উঠানটায় বস্তি, শ্রমিক শ্রেণীর লোকজন বাঁশ আর পলিথিন দিয়ে মাথাগোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে। বস্তির ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে উঁচু একটা বারান্দায় উঠল রানা। এখানেও অনেক লোক শুয়ে আছে। তাদেরকে সাবধানে টপকে এল ও, তারপর ঢুকে পড়ল একটা টাওয়ারের নিচে। প্যাঁচানো পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় বার কয়েক থামল ও, কেউ পিছু নিয়েছে কিনা দেখছে। সিঁড়ির ধাপে কেউ নেই। কোন শব্দও পেল না।

সঙ্গে স্থানীয় কেউ না থাকলে বনভূমিতে ঢোকা ঠিক হবে না, বনরক্ষীরা চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে। অথচ সৈকত পর্যন্ত দীর্ঘ পাকা রাস্তাটা একবার দেখা দরকার, দেখা দরকার বনভূমির কোথায় কি আছে। কোন রকম ঝুঁকির মধ্যে না

গিয়ে রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দুর্গের মাথা থেকে যতদূর সম্ভব এলাকাটার ওপর চোখ বুলিয়ে নেবে।

টাওয়ারের চারদেয়ালের ভেতর সিঁড়িটা। ত্রিশ ফুট ওঠার পর রানা দেখল, দেয়াল বলে আর কিছু নেই। ধাপগুলোর দু'পাশ এখন ফাঁকা, এমন কি ধরার মতও কিছু নেই। তারপর পাওয়া গেল কাঠের ধাপ, তা-ও কালের আঁচড় লেগে পচে গেছে, নড়বড় করছে ফ্রেম। পাথরের ধাপ ভেঙে যাওয়ায় কাঠের এই ধাপ লাগানো হয়েছে, যদিও তারপর আর মেরামত করা হয়নি।

ওপরে ওঠাটা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠল। একবার থেমে রানা ভাবল, ফিরে যাবে কিনা। কিন্তু মন সায় দিল না। আর বিশ ফুটের মত উঠতে পারলেই দুর্গের মাথায় পৌঁছে যাবে ও। আশি ফুট উঠতে পেরেছে, বাকি বিশ ফুট না উঠতে পারার কোন কারণ নেই।

কিন্তু দেখা গেল সিঁড়ি শেষ হয়েছে দুর্গের ছাদ সাড়ে তিন কি চার ফুট দূরে থাকতেই। এখানেও কাঠের ধাপ ছিল, কিন্তু ভেঙে গেছে। ধরার কিছু নেই, তীব্র বাতাসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই সমস্যা, এই অবস্থায় লাফ দিতে গিয়ে যদি পা পিছলায়, তাহলে আর দেখতে হবে না, সোজা নিচে...বেশি চিন্তা না করে দম আটকাল রানা, তারপর লাফ দিল।

নিরাপদেই ছাদে চলে এল ও। ছাদটা বিশাল। চারকোণে চারটে ছোট টাওয়ার দেখা যাচ্ছে, প্রায় অক্ষতই বলা যায়। ছাদের দক্ষিণ দিকটায় চলে এল ও। কামান বসানোর ফোকরগুলো অনেক কাল আগেই ভেঙে গেছে। রেলিং বলতে কিছুই নেই। কিনারা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বনভূমির ওপর চোখ বুলাল রানা।

আঁকাবাঁকা রাস্তাটা বেশ অনেক দূর পর্যন্ত দেখা গেল, কখনও পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে এগিয়েছে, কখনও হারিয়ে গেছে নিবিড় গাছপালার আড়ালে। কুয়াশা থাকায় এত দূর থেকে সাগর দেখা যাচ্ছে না। এত কষ্ট করে ওপরে ওঠায় লাভ হলো এই যে বনভূমিতে কিছু দূর পর পর কাঠের তৈরি ওয়াচটাওয়ার দেখতে পেল রানা। সন্দেহ নেই, ওগুলো থেকে বনভূমির ওপর নজর রাখে মিলোসেভিচের বেতনভুক বনরক্ষীরা। তাহলে ধরে নিতে হয় এদিকে পোচারদের উপদ্রবও আছে।

একেবারে কিনারায় না দাঁড়ালে নিচের শহরটা দেখা যাবে না। পিছিয়ে এসে দক্ষিণ প্রান্তের টাওয়ারের দিকে এগোল রানা। খানিক দূর যাবার পর দেখতে পেল এদিকের দুর্গ-প্রাকার অনেকটাই অক্ষত। গর্তে পা দিয়ে পাঁচিলের মাথায় উঠল ও। বেশ চওড়া পাঁচিল, পড়ে যাবার কোন ভয় নেই। তবু সাবধানেই দরজাবিহীন টাওয়ারটার দিকে এগোল। সামনে একটা প্ল্যাটফর্ম দেখা গেল। কিছুদিন আগেও এখানে একটা রেস্তোরাঁ ছিল। ফরমিকা-টপ কাউন্টার ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। একপাশে স্তূপ হয়ে আছে অনেকগুলো টেবিল আর চেয়ার। একটা রিফ্রিজারেটরকেও শুয়ে থাকতে দেখা গেল। টাওয়ারের বাইরে ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা ছিল, রাতে ব্যাটলমেন্টে আলো ফেলা হত। ফ্লাডলাইটটা ভেঙে গেছে, চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে কাঁচের টুকরো।

নিচের শহরটাকে এখান থেকে অনেক দূরে মনে হলো। লোকজনের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, মোরগের ডাক, চার্চ থেকে ভেসে আসা ভোঁতা ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ঘুম ভাঙছে শহরের। মুখ তুলে দূরে তাকাল রানা। বনভূমির শেষ প্রান্ত কুয়াশায় ঢাকা। এখান থেকে বাডভা ত্রিশ কিলোমিটার দূরে, তারপর সাগর। সৈকত থেকে ইটালি একশো মাইলও নয়, কোন রকমে পেরিয়ে যেতে পারলেই আমৃত্যু পাগল হয়ে থাকার অভিশাপ থেকে বেঁচে যাবেন সাঈদ মুর্তজায়েভ।

কি কারণে চমকে উঠল বলতে পারবে না রানা। তবে ঝট্ করে ঘুরতেই টুইডের সুট পরা শক্ত-সমর্থ লোকটাকে দেখতে পেল, ওর দিকে ক্যামেরা তাক করছে। সম্ভবত মন্ট্রিনিগ্রোরই লোক, তবে চেহারায় জার্মান ভাব আছে। লোকটা এমন এক ভাষায় কথা বলল, কিছুই বুঝতে পারল না রানা। ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, জার্মান–কিছুই সে বোঝে না। অসহায় একটা ভঙ্গি করে পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করল সে, ছবি এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করল টাওয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের একটা ফটো তুলতে চায়, রানার সাহায্য দরকার। তারপর ইঙ্গিতে দেখাল কিভাবে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে শাটার টিপতে হবে। দূরে সরে গেল সে, টাওয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে পোজ দিল, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে।

ফটো তোলার পর ক্যামেরাটা ফিরিয়ে দিল রানা।

কিন্তু আবার লোকটা মূকাভিনয় শুরু করল। ভাব-ভঙ্গি আগের চেয়েও ব্যাকুল। কি ব্যাপার? না, সৌজন্যবশত রানারও একটা ফটো তুলতে চাইছে সে। লোকটা হঠাৎ উদয় হওয়ায় প্রথম থেকেই কেমন যেন একটা অস্বস্তিবোধ করছে রানা। মাথা নেড়ে ফটো তুলতে অসম্মতি জানাল। কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা। অগত্যা আপদ বিদায় করার জন্যে রাজি হতে হলো ওকে। পোজ দেয়ার জন্যে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল ও। চোখে ক্যামেরা তুলল লোকটা। তার আঙুল ক্যামেরার মাথায় বসানো অন্য একটা বোতাম ছুঁলো। সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দিল রানা। গুলির আওয়াজটা ভোঁতা, যেন কেউ চড় মেরেছে। রানার পিছনে, ফরমিকা টপ কাউন্টারে লেগেছে বুলেটটা। ডাইভ দিয়ে পাঁচিলেই পড়েছে রানা, কিন্তু সিধে হতে গিয়ে পারল না। লোকটা এগিয়ে এসে ক্যামেরা দিয়ে বাড়ি মারল ওর মাথায়। পাঁচিলের মেঝের সঙ্গে ঠুকে গেল রানার কপাল। লোকটা আরও এগিয়ে এসে ওর মাথা লক্ষ্য করে লাথি মারতে যাচ্ছে। তার পায়ের গোড়ালি ধরে সজোরে মুচড়ে দিল রানা, ধপাস করে পাঁচিলের ওপর পড়ল ভারী শরীরটা। ইতিমধ্যে রানার হাতে ওয়ালথারটা বেরিয়ে এসেছে। 'দাঁড়া শালা, সিধে হ!' ওর কঠিন মূর্তি দেখে ধীরে ধীরে দাঁড়াল লোকটা। 'হাত দুটো মাথার পিছনে রাখ!' শুধু ইংরেজিতেই কাজ হচ্ছে, মূকাভিনয়ের দরকার পড়ছে না।

ব্যাপারটা রানার কাছে রীতিমত ধাঁধার মত লাগছে? এখনও ওর হাতে মাইক্রোফিল্মটা আসেনি, এই অবস্থায় কে ওকে খুন করতে চাইবে? কার্চিক জোডার যমজ ভাইয়ের কথাই ধরা যাক–তার সঙ্গে রানার দ্বন্দ্বটা ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পৌঁছেছে, নিজের হাতে রানাকে খুন করার যে তৃপ্তি, সেটা থেকে সে বঞ্চিত হতে চাইবে না। পুলিস চীফ ড. সিডাককে টোপ গেলানো

হয়েছে–রানা তাঁকে মুর্তজায়েভের বাড়িতে নিয়ে যাবে, এই অপেক্ষায় থাকবেন তিনি।

বাকি থাকল জেমস ফোলি। পাণ্ডুলিপিগুলো রানার হাতে পড়ুক, এটা সে চায় না। 'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ভ. সিডাক? কার্চিক জোডা?' লোকটা এক চুল নড়ছে না। 'নাকি জেমস ফোলি?'

রানা থামতে হলুদ দাঁত বের করে হাসল লোকটা। প্রফেশনাল, প্রচুর সময় নিয়ে টরচার না করলে মুখ খোলানো যাবে না। কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়। 'ঠিক আছে, চলো, পুলিসই তোমার মুখ খোলাবে।' লোকটার পেটের দিকে ওয়ালথার ধরে সামনে এগোচ্ছে ও। 'পিছন ফিরে দাঁড়াও, তোমাকে আমি সার্চ করব।'

লোকটা ঘুরল। ঘুরেই ছুটল।

ওয়ালথার ধরা হাতটা লম্বা করল রানা, ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল। মাত্র সাত-আট গজ দূরে লোকটা, ইচ্ছে করলেই তার মাথাটা উড়িয়ে দিতে পারে ও। কিন্তু ট্রিগারটা টানতে পারছে না, কোথায় যেন বাধছে। রানা পিছু নিয়েছে কিনা দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাল লোকটা, আর ঠিক তখনই হোঁচট খেলো। ডানা মেলা পাখির মত একটা ভঙ্গি করল, পাঁচিলের কিনারা থেকে দুর্গের নিচে পড়ে যাচ্ছে। এক কি দুই সেকেন্ড স্থির থাকল সে, কিন্তু কোনভাবেই আর ভারসাম্য ফিরে পেল না। একেবারে শেষ পর্যায়ে বাতাসকে আলিঙ্গন করল লোকটা। শুরু হলো দীর্ঘ পতন।

উঁকি দিয়ে নিচে তাকিয়ে লোকটাকে একটা ঝোপের পাশে পড়ে থাকতে দেখল রানা। ক্যামেরাটা তুলে কয়েকটা আছাড় মারল ও, তারপর ফেলে দিল নিচে।

ফ্ল্যাটে এসে নোভাকে রানা কিছুই বলল না। শাওয়ার সেরে নাস্তা খেতে বসল। খুব উৎসাহের সঙ্গে বলে যাচ্ছে নোভা, সারাটা দিন আজ কোথায় কোথায় ঘুরবে ওরা।

বেড়াতে বেরিয়ে এলাকা সম্পর্কে মূল্যবান কয়েকটা তথ্য পেল রানা। কোটর আর বাডভার বেশিরভাগ জায়গা যেহেতু মিলোসেভিচ কিনে নিয়েছেন, তাই ব্যক্তিগত খামারগুলোয় আসা-যাওয়া করতে হলে বনরক্ষীদের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয়। মিলোসেভিচের বনভূমিতে ব্যক্তিগত যানবাহন নিয়ে প্রবেশ করা নিষেধ। তবে চাইলে বনরক্ষীরা নিজেদের ভ্যানগাড়ি ধার দেয়, কিংবা খামারবাড়ির লোকজনকে নিজেরাই পৌঁছে দেয়। ভ্যানগাড়ি পাওয়া গেলে ভাল, তা না হলে হেঁটে আসা-যাওয়া করতে হয়। নোভা ওকে আরও জানাল, বনরক্ষীদের কয়েকজন ড্রাইভার কোটরের বাসিন্দা, তার পরিচিত। সে চাইলে ভ্যানগাড়ি পাওয়া যাবে।

সকালে ওরা শহর থেকে বেরিয়ে বনরক্ষীদের ছাউনিতে চলে এল। বনরক্ষীদের কমান্ডার নোভাকে চেনে, তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হাঁটতে বেরুল ওরা। একটাই পাকা রাস্তা, ঢেউ খেলানো পাহাড়ের ওপর দিয়ে সেই সাগর পর্যন্ত চলে গেছে, শাখা রাস্তাগুলো ইঁট বিছানো। মাইল দুয়েক হাঁটার পর ফিরতি

পথ ধরল ওরা। নোভাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলবে কিনা, এ নিয়ে রানার মনে একটা দ্বিধা আছে। এখনও মনস্থির করতে পারছে না। এ শুধু নোভাকে বিশ্বাস করার প্রশ্ন নয়, এর সঙ্গে তার নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত।

দুপুরে সরাইখানায় খেলো ওরা। দু'জনেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। সময় কাটানো একটা সমস্যা বলে মনে হচ্ছে এখন। রানার ইচ্ছে নিজের কামরায় উঠে বিশ্রাম নেবে। কিন্তু কথাটা বলা হলো না। তার আগে নোভা প্রস্তাব দিল, 'আমার স্টুডিওতে চলো, রানা। আমি তোমার একটা ছবি আঁকব। পরে যদি তোমার একটা মূর্তি গড়তে চাই, ছবিটা কাজে লাগবে।'

'আমার মূর্তি? কেন, কি দরকার?'

'তোমাকে ধরে রাখব, সে সাধ্য আমার নেই,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ঝাপসা কণ্ঠে বলল নোভা। 'দু'দিনের জন্যে হলেও তোমাকে পেয়েছিলাম, সেই স্মৃতিটা অন্তত থাকুক আমার কাছে।'

এ-প্রসঙ্গে বেশি কথা বললে নোভার ভাবাবেগ উথলে উঠতে পারে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেল রানা। ফ্ল্যাটে ফিরে একটা চেয়ারে বসল ও। ইজেলে ক্যানভাস চড়িয়ে কাজ শুরু করল নোভা।

কিন্তু একটু পরই হাতের রঙ তুলি ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। 'আমি একটা বোকা, রানা!'

'কেন, কি হলো?'

'সবচেয়ে বড় ক্যানভাস তো মন, সেখানে তোমার স্মৃতি চিরকাল অম্লান থাকবে।' বিষণ্ন হাসি লেগে আছে নোভার ঠোঁটে। 'মূর্তিটা গড়ার সময় অন্তরের চোখ খুলে তোমাকে দেখে নেব।'

'তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'আমার ফিরে যাবার সময় হয়ে এসেছে।'

রানার দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল নোভা। 'সময় হয়ে এসেছে?' বিড়বিড় করল সে।

'হ্যাঁ, খুব বেশি হলে আর হয়তো এক হপ্তা আছি।'

'প্ল্যানটা কি, আমাকে বলবে না?' ফিসফিস করল নোভা।

'বলব বৈকি, সময় হলেই বলব। আচ্ছা, সুযোগ পেলে তুমি কি আমার সঙ্গে লন্ডনে যাবে?'

'না। এখানে আমার অনেক কাজ আছে।'

'কি কাজ?'

'যুগোস্লাভিয়া থেকে আলাদা হয়ে মন্টিনিগ্রো স্বাধীন হতে চাইছে,' বলল নোভা। 'একটু হয়তো সময় লাগবে, কিন্তু স্বাধীন আমরা হবই। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে আমার বা আর কারও নিরাপত্তা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করতে হবে না।' হঠাৎ হাসল সে। 'তখন যদি তোমাকে ডাকি, রানা? তুমি আসবে না?'

'নিশ্চয়ই আসব,' বলল রানা। 'কিন্তু তার তো দেরি আছে, নোভা। আমি পাণ্ডুলিপি আর ডকুমেন্টটা নিয়ে চলে যাবার পর কি হবে সেটা ভেবে দেখেছ?'

'যা হবার হবে, এ নিয়ে এখুনি চিন্তা করে কি লাভ?'

'আমি একটা বুদ্ধি করেছি,' বলল রানা। 'টপ সিক্রেট ডকুমেন্টের একটা কপি তোমাকে দিয়ে যাব। ড. সিডাককে তুমি বলবে, মুর্তজায়েভকে আটকাতে পারোনি ঠিকই, কিন্তু ডকুমেন্টটা কৌশলে আমার কাছ থেকে রেখে দিয়েছ।'

'বাহ্, চমৎকার!' হেসে উঠল নোভা, যেন জোর করেই। 'সিডাক আঙ্কেল দারুণ খুশি হবেন। ভাল কথা, কাল রাতে সুজা আঙ্কেল আমার কাছে এসেছিলেন। শুনলাম তুমি নাকি বাডভায় যাচ্ছ। কাগজগুলো আনতে। তা কবে যাচ্ছ?'

'আজ রাতে, আর কয়েক ঘণ্টা পর।'

'আজই!' নার্ভাস দেখাল নোভাকে। 'কিন্তু, রানা, তোমাকে তো আমি একা ছাড়তে পারব না। তোমার সঙ্গে যেতে হবে আমাকেও।'

কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

ছ'টা বাজতেই সরাইখানায় ডিনার খেয়ে নিল ওরা, সূর্য তখন মাত্র পাটে বসেছে। দু'জনে একসঙ্গেই বেরুল, হাত ধরাধরি করে। বনরক্ষীদের ছাউনিটাকে পাশ কাটাবার সময় ফিসফিস করল নোভা, 'পিছনে লোক লেগেছে।'

'না লাগলেই অবাক হতাম,' বলল রানা। 'ব্রিফকেস থেকে লুগারটা এনেছ তো?'

'এনেছি।'

অলস পায়ে হাসাহাসি করতে করতে হাঁটছে ওরা। বাঁক ঘোরার পর অদৃশ্য হয়ে গেল শহরের পাঁচিল, সরাইখানা, বনরক্ষীদের তাঁবু। এই রাস্তা পাহাড়ের গায়ে উঠেছে, তবে ঢালটা এখনও শুরু হয়নি। ফাঁকা রাস্তায় লুকাবার উপায় নেই, ঘাড় ফেরালেই ফেউগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। দু'জন লোক, পরস্পরের কাছ থেকে খানিকটা ব্যবধান রেখে পিছু পিছু আসছে। লোক দু'জনের পিছনে, ইঁট বিছানো সরু একটা গলির মুখে, বনরক্ষীদের একটা ভ্যানগাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সন্ধে ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শীতও বাড়ছে। কোটটা পরে নিল রানা, তারপর নোভাকে পরতে সাহায্য করল। এই সুযোগে আরেকবার পিছন দিকে তাকাল ও। তাকাতেই হাসি পেল। লোকগুলো কি করবে বুঝতে পারছে না—একজন রাস্তার ধারে প্রস্রাব করতে দাঁড়িয়েছে, আরেকজন ঝুঁকে ঘাসের ডগা ছিঁড়তে ব্যস্ত।

একটা হাফ-ট্রাক দ্রুতবেগে ওদেরকে পাশ কাটাল। খানিক দূরে গিয়ে সজোরে ব্রেক কষল ড্রাইভার, তারপর পিছিয়ে এসে ওদের পাশে থামল। ড্রাইভিং সীটে সুজায়েভকে দেখা গেল। 'ভাব দেখাও আমাকে পথ-নির্দেশ দিচ্ছ,' নোভাকে বলল সে। হাত তুলে অভিনয় শুরু করল নোভা। 'এক হাজার মিটার সামনে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়েছে রাস্তা,' বলে চলেছে সুজায়েভ। 'বাঁকটা ঘুরলে পিছনের ওরা তোমাদেরকে আর দেখতে পাবে না। বাঁক ঘুরেই ছুটবে।' একটা হাত নাড়ল সে, তারপর গিয়ার দিয়ে হাফ-ট্রাক ছেড়ে দিল।

ইতিমধ্যে পিছনের লোক দু'জন ওদেরকে লক্ষ করে ছুটতে শুরু করেছে। তাদের পিছন থেকে ভ্যানগাড়িটাও রওনা হলো। তবে হাফ-ট্রাকে রানা ও নোভা

ওঠেনি দেখে ভ্যানগাড়ি আবার রাস্তার ধারে পার্ক করল, লোক দু'জনও দৌড় থামিয়ে আগের মত হাঁটছে।

রাস্তা ক্রমশ উঁচু আর সরু হতে শুরু করল। বাঁকটা দূর থেকেই দেখতে পেল ওরা। ওদের সামনে পাঁচতলা বাড়ির মত প্রকাণ্ড একটা বোল্ডার পড়ে আছে, প্রায় চারকোনা; সেটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়েছে রাস্তাটা। ওরা বাঁক ঘোরার পর পিছনের রাস্তা অদৃশ্য হয়ে গেল। নোভার হাত ধরে ছুটল রানা। সামনে থেকে অকস্মাৎ ধেয়ে আসতে দেখা গেল ক্যানভাস ঢাকা সাতটনী একটা ট্রাক–বনরক্ষীদের ভ্যানগাড়ি। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে বাঁকের মুখে আড়াআড়ি ভঙ্গিতে থামল সেটা, এঞ্জিন বন্ধ করে লাফ দিয়ে নিচে নামল ড্রাইভার, ছুটে ঢুকে পড়ল পাশের জঙ্গলে।

ছুটতে ছুটতে আরও একটা বাঁক ঘুরল ওরা। সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সুজায়েভের হাফ-ট্রাক। ওরা দু'জন ক্যাবে উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল সে।

বাডভা ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু বিশ কিলোমিটার পেরুবার পরই বেঁকে বসল হাফ-ট্রাক। রেডিয়েটরে পানি নেই দেখে আসাদ নামে কারও চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করছে সুজায়েভ। জানা গেল, বনরক্ষীদের ড্রাইভার আসাদ তার বন্ধুর ছেলে, পাঁচ হাজার দিনার দিয়ে হাফ-ট্রাকটা ধার নেয়ার সময় সে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিল, ট্রাকে তেল-পানি সব ভরে দেয়া হয়েছে।

'দশ কিলোমিটার কি হাঁটতে হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই অন্ধকারে?' মাথা নাড়ল নোভা। 'রাতে নিজেদের গাড়ি দেখলে বনরক্ষীরা কিছু বলবে না। কিন্তু কাউকে হাঁটতে দেখলে থামাবে। আমাকে দেখলে আটকে হয়তো রাখবে না, কিন্তু প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে জান খারাপ করে দেবে। সুজা আঙ্কেল, কাছেপিঠে ঝর্না নেই?'

'আছে, তিন কিলোমিটার হাঁটতে হবে,' বলে একটা জেরিক্যান নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সে।

হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে ট্রাকের পিছনে বসে থাকল ওরা। ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের ঢালে রয়েছে, চারপাশে গভীর জঙ্গল। ঝিঁঝি পোকার ডাকাডাকিতে কান পাতা দায়। চাঁদ নেমে গেছে পশ্চিম দিগন্তের কাছে গাছপালার আড়াল থাকায় দেখা যাচ্ছে না। ওরা বসেছে স্তূপ করা একটা তেরপলের ওপর। এক সময় রানার হাতটা ধরে নিজের কোলের ওপর তুলে নিল নোভা। আঙুলগুলো মটকে দিচ্ছে। 'নিজের সম্পর্কে আমাকে তুমি প্রায় কিছুই বলোনি, রানা।'

'না, বলিনি।'

'কেন?'

'বলার তেমন কিছু নেই যে, তাই।'

'না বললেও, অনেক কিছুই আমি আন্দাজ করতে পারি, রানা।'

'তাই নাকি? শুনি তো?'

'তুমি একজন স্পাই।'

'মাই গড!'

'তুমি বিয়ে করোনি।'

'কি করে বুঝলে?' রানা এবার সত্যি বিস্মিত।

'তোমার খেলা মৃত্যু বা আজরাইলের সঙ্গে, রানা। কঠিন বাস্তবতা তোমাকে নিষ্ঠুর হতে শিখিয়েছে। তবে তোমার মত বেপরোয়া পুরুষের জীবনে নারী পরম বন্ধু হিসেবেই উদয় হয়। তুমি তাদেরকে দেবীর আসনে বসাও। কিন্তু তাদের কাউকেই খুব বেশি কাছে আসতে দাও না, সব সময় একটা দূরত্ব বজায় রাখো। তুমি যে-কোন দিন হারিয়ে যেতে পারো, তাই তাদের কাউকে বাঁধনেও জড়াও না।'

রানা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল।

'তোমার জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, রানা,' বিড়বিড় করল নোভা। 'কারণ পৃথিবীতে তোমার মত নিঃসঙ্গ মানুষ খুব কমই আছে। একদিক থেকে তোমার জীবন অভিশপ্তই বলতে হবে।'

নোভার গলার সুরে এমন কিছু ছিল, একটা হাত তুলে তার গালে আঙুল বোলাল রানা। 'এ কি, নোভা! তুমি কাঁদছ!'

'দু'দিনের জন্যে হলেও, তোমাকে কাছে পেয়ে নিজেকে আমার সুখী মনে হয়েছে,' ধীরে ধীরে বলল নোভা। 'কিন্তু তার বিনিময়ে তোমার জন্যে আমার কিছুই করার নেই। আমার যদি ক্ষমতা থাকত! যিশু! আমি যদি তোমাকে সুখী করতে পারতাম!'

জোর করে হাসল রানা। 'মিষ্টি মেয়ে, কে বলল আমি সুখী নই?'

রানার গালে নিজের গালটা চেপে ধরল নোভা। 'অস্বীকার করে লাভ নেই, রানা। আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি। আমি সামান্য একটা মেয়ে, কতটুকুই বা বুদ্ধি আমার, তবু বলি—যদি সম্ভব হয়, এক সময় থেমো। কাউকে চিরকালের জন্যে আপন করে পাওয়া, হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতই লোভনীয়...'

'স্বর্গ তো এই মুহূর্তে আমাদের হাতের মুঠোতেই। এসো, নোভা, কাল কি হবে ভুলে যাই। আজ, এই মুহূর্তে, এসো আমরা সুখী হই।'

'হই,' রানার কানে ফিসফিস করল নোভা।

পানি নিয়ে দু'ঘণ্টা পর ফিরল সুজায়েভ। কোন ঘটনা ছাড়াই আরও দশ কিলোমিটার পার হয়ে এল ওরা। একটা মাঠের পাশ দিয়ে যাবার সময় সারি সারি কয়েকটা কুঁড়েঘর দেখাল নোভা, ওদের খামারবাড়ি। তবে অন্ধকারে কিছুই তেমন পরিষ্কার নয়। খামারবাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে উপত্যকার একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এল হাফ-ট্রাক। থামল একটা চার্চ ও কবরস্থানের পাশে।

'এখানে থামলেন কেন, সুজা আঙ্কেল?' অবাক হয়ে জানতে চাইল নোভা।

নিচে নেমে ট্রাকের পিছন থেকে একটা কোদাল আর একটা টর্চ নিল সুজায়েভ। 'এসো আমার সঙ্গে, বলছি।' ভাঙা গেট পেরিয়ে কবরস্থানে ঢুকে পড়ল সে। নোভা আর রানা পিছু নিল।

কবরস্থানটা দু'ভাগে ভাগ করা, মাঝখানে নিচু একটা পাঁচিল। পাঁচিলের ওপারে, বেশ খানিকটা দূরে, গম্বুজ আকৃতির কি যেন দেখা যাচ্ছে। 'কি ওটা?'

নোভার হাত ছুঁয়ে জানতে চাইল রানা।

'পাঁচিলের ওপারে তোমাদের কবরস্থান, মানে মুসলমানদের,' বলল নোভা। 'আকাশের গায়ে গম্বুজ দেখতে পাচ্ছ? ওটা মসজিদ।'

'বাডভায় মসজিদ আছে, কিন্তু কোটরে নেই কেন?'

'নেই, কারণ কার্চিক জোডার যুবদল কোটরের মুসলমানদের মেরে ভাগিয়ে দিয়েছে, মসজিদগুলোকে করা হয়েছে চার্চ, আশ্চর্য কি জানো, ওই নতুন চার্চগুলোয় কোন খ্রিস্টান প্রার্থনা করতে যায় না।'

পাঁচিলের এপারেই, একটা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল সুজায়েভ। 'এসো, নোভা। যা তুমি জীবনে কোনদিন দেখবে বলে ভাবোনি, আজ তোমাকে তাই দেখাই।'

'কি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল নোভা।

'এই যে কবরটা দেখছ, এখানে আমার প্রিয় বন্ধু শুয়ে আছে। সাঈদ মুর্তজায়েভ আমাকে নির্দেশ দেন, আমি আমার খ্রিস্টান বন্ধুদের গোপনে খবর দিয়ে এখানে ডেকে আনি। আমাদের সামনে নিকোলাই সুনজাককে এখানে কবর দেয়া হয়েছে।'

'ওহ্, গড!' কবরের পাশে ঝপ করে বসে পড়ল নোভা। 'কিন্তু আমি তো সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, বাবার লাশটা পাওয়া যায়নি...'

'তুমি হয়তো জানো, এদিকের একটা পাহাড়েই লুকিয়ে ছিলেন মুর্তজায়েভ। তোমার বাবা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে খুন হয়ে যান। কার্চিক জোডা লাশের কোন ব্যবস্থা না করেই বেলগ্রেডে ফিরে যায়। পুলিস এসে লাশ খুঁজবে, মর্গে নিয়ে গিয়ে কাটাছেঁড়া করবে, মুর্তজায়েভ এটা চাননি। ভাল করে দেখো, কবরে কারও নাম নেই। ইচ্ছা করেই নাম লেখানো হয়নি, কেউ যাতে চিনতে না পারে।'

বাবার কবরে হাত বুলাচ্ছে নোভা। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এসেছে।

টর্চটা রানার হাতে দিয়ে কবরের আরেক মাথায় কোদাল চালাতে শুরু করল সুজায়েভ।

আঁতকে উঠে নোভা বলল, 'কি করছেন!'

'না-না, কবরের কোন ক্ষতি হবে না,' তাড়াতাড়ি আশ্বস্ত করল সুজায়েভ। কবরের পায়ের দিকটা তিন ফুট খুঁড়তেই স্টীলের একটা চৌকো বাক্স বেরুল। বাক্সটা তুলে রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'এটায় তালা দেয়া আছে, কিন্তু চাবিটা আমার কাছে নেই।'

'আমার কাছে আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু বাক্সটা আমি নিরিবিলি কোন জায়গায় খুলতে চাই, একা। সেখানে আলোও থাকতে হবে।'

'মোমের আলো হলে চলবে?' জিজ্ঞেস করল সুজায়েভ।

'হ্যাঁ, চলবে।'

'আসুন,' বলে হাঁটা ধরল সুজায়েভ।

উপত্যকা থেকে ঢাল বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠল ওরা। সরু পথ, ভেড়ার পাল আসা-যাওয়ায় তৈরি হয়েছে। প্রশস্ত একটা মালভূমিতে পৌঁছাল ওরা, চারদিকে পাইন আর সাইপ্রেস গাছের ছড়াছড়ি। রাখালদের কুঁড়েটা একজোড়া

বুড়ো ওক গাছের মাঝখানে। ভেতরে ঢুকে দুটো মোমবাতি জ্বালল সুজায়েভ। দেয়ালগুলো নিরেট পাথর, ছাদে স্লেট ব্যবহার করা হয়েছে। ফার্নিচার বলতে বেঢপ সাইজের একটা টেবিল, খানকতক হাতলবিহীন চেয়ার।

একটা চেয়ারে বসে টেবিলে হাত রাখল নোভা, হাতের ওপর চিবুক ঠেকিয়ে চোখ বুজল। বোঝাই যায়, সে তার বাবার কথা ভাবছে।

'এখানে আপনি কতক্ষণ থাকবেন?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সুজায়েভ।

'ট্রাকটা আপনি সম্ভব হলে কোথাও লুকিয়ে রাখুন,' বলল রানা। 'আমাদেরকে নিতে আসবেন এক ঘণ্টা পর।'

সুজায়েভ চলে যাবার পর চাবি বের করে বাক্সটা খুলল রানা। পলিথিনে মোড়া তিনটে পাণ্ডুলিপি রয়েছে ভেতরে। ছোট একটা প্লাস্টিকের কৌটার ভেতর পাওয়া গেল খুদে বোতাম আকৃতির মাইক্রোফিল্ম।

নিঃশব্দে রানার দিকে তাকিয়ে আছে নোভা।

'এটা একটা নেগেটিভ ফিল্ম,' মাইক্রোফিল্মটা দেখিয়ে বলল রানা। 'ওয়াশ ও এনলার্জ না করলে বোঝা যাবে না কি আছে এতে। আর, কি আছে না জেনে আমি কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নই।'

'ওয়াশ কিংবা এনলার্জ করতে হলে বেলগ্রেড অথবা পডগোরিকায় যেতে হবে তোমাকে,' বলল নোভা। 'পডগোরিকায় আমার পরিচিত একটা স্টুডিও আছে, একমাত্র সেখানেই কাজটা গোপনে করা সম্ভব।'

'কিন্তু আমি চাই বেলগ্রেড থেকে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে, এই বাড়ভাতেই থাকো তুমি,' বলল রানা। 'তুমি যদি চিঠি লিখে দাও, স্টুডিওর মালিক কাজটা করে দেবে? তার আগে বলো, লোকটা কি বিশ্বস্ত?'

'হ্যাঁ, বিশ্বস্ত,' বলল নোভা। 'সাঈদ আঙ্কেলের আপন ভাই তিনি। ঠিক আছে, কাগজ-কলম দাও, চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি বেলগ্রেডে ফিরে যাবে, তারপর আবার আসবে, এ-সব কিন্তু কিছুই আমাকে জানাওনি।'

'এই তো জানালাম। বাকি সবও ধীরে ধীরে জানতে পারবে।'

প্লাস্টিকের বাক্সটা জানালা দিয়ে ফেলে দিল রানা। রোলেক্স রিস্টওয়াচের পিছনের ঢাকনি খুলে মাইক্রোফিল্মটা লুকিয়ে রাখল ভেতরে। ঘড়িটা আবার কব্জিতে বাঁধছে, পলিথিনের মোড়ক খুলে একটা পাণ্ডুলিপি বের করল নোভা। 'এটায় শুধু কবিতা, রানা।'

'তোমার সাবজেক্ট হলেও, এখন ওটা রাখো,' বলল রানা। 'ওঁর আত্মজীবনী আর রাজনীতির ওপর লেখা বইটা থেকে এক-আধটু পড়ে শোনাও দেখি।'

নোভা শুধু আত্মজীবনীর ভূমিকাটা ইংরেজিতে ভাষান্তর করে শোনাল রানাকে। রাজনীতির ওপর লেখা বইটার নাম দেয়া হয়েছে, 'বলকানে কার কি স্বার্থ'। পাতার পর পাতা উল্টে গেল নোভা, মাঝে মধ্যে দু'চার প্যারা ভাষান্তর করে শোনাচ্ছে। ঘড়ির ওপর একটা চোখ রেখেছে রানা। সুজায়েভের ফিরে আসতে এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি।

নোভা পড়ছে, 'মন্ট্রিনিগ্রোর ভবিষ্যৎ সার্বদের হাতে নিরাপদ নয়, এটা আর নতুন করে ব্যাখ্যা না করলেও চলে। তবে আমেরিকার সাহায্য নিয়ে মন্ট্রিনিগ্রো

স্বাধীন হবে, এ-ও আমরা চাইতে পারি না। কারণ ওয়াশিংটন চিরকালই বলকানের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে...'

'ওয়াশিংটন এখানে উপস্থিত থাকলে এই মিথ্যে অভিযোগের প্রতিবাদ করত,' নতুন একটা কণ্ঠস্বর বাধা দিল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জেমস ফোলি, হাতে একটা অটোমেটিক রাইফেল। তার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছেন ম্যাক বিলিয়ার্ড, হাতে একটা কোল্ট .৪৫। তাঁর কাঁধের ন্যাপস্যাকটা রানার দৃষ্টি এড়ায়নি, ডিপ্লোম্যাটিক ডিসপ্যাচ পাউচের মত দেখতে।

'সারপ্রাইজড, মি. রানা?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করল ফোলি।

'এক অর্থে নয়,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'যেখানে মধু, মৌমাছি তো সেখানে আসবেই।'

'আপনাকে সহযোগিতা করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আপনি রাজি হননি,' কঠিন সুরে বলল ফোলি। 'এখন আমরা পরস্পরের প্রতিপক্ষ। মূর্তজায়েভের পাণ্ডুলিপি আর ডকুমেন্টটা আমরা নিয়ে যাব। প্লীজ, বাধা দেবেন না।'

'এটা কি আপনার বাপের সম্পত্তি যে নিয়ে যাব বললেই নিয়ে যেতে পারবেন?' রানা রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করছে না।

'নিয়ে যেতে এসেছি, নিয়েও যাব, প্রয়োজনে আপনাকে খুন করে হলেও,' বলল ফোলি। 'বিশ্বাস করুন, আপনাকে খুন করতে আমার খারাপ লাগবে না। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা আমি উপভোগই করব।'

ফোলিকে পাশ কাটিয়ে টেবিলের দিকে এগোলেন বিলিয়ার্ড, লক্ষ রাখলেন ফোলির লাইন অভ ফায়ারে বাধা হচ্ছেন না। টেবিলে পড়ে থাকা পাণ্ডুলিপি দুটো কাঁধের ব্যাগে ভরলেন তিনি। শেষ পাণ্ডুলিপিটা নোভার হাত থেকে টেনে নিলেন।

নোভা বলল, 'ম্যাক আঙ্কেল, কবিতার বইটা সাঈদ আঙ্কেল আপনার নামে উৎসর্গ করেছেন।'

'তাই নাকি!' কবিতার পাণ্ডুলিপিটাও নিজের ব্যাগে ভরলেন বিলিয়ার্ড। 'ইন্টারেস্টিং। আমার একটা প্রস্তাব আছে, মি. রানা। এগুলো আমার কাছেই থাকবে। আমি একটা একটা করে ফোলিকে পড়তে দেব। পড়ে দেখার পর সে যদি আমাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারে যে এগুলো ছাপা হওয়া উচিত নয়, আমি তাকে পাণ্ডুলিপি সংশোধন করার সুযোগ দিতে চাই। সে সংশোধন করবে ডুপ্লিকেট কপিতে। মূল কপিগুলো আমার কাছেই থাকবে। পরে আমি সেগুলো আপনাকে দিতে পারি, কিংবা পুড়িয়েও ফেলতে পারি।'

'আপনাকে তো আমি বলেইছি, মি. বিলিয়ার্ড, আপনার এই প্রস্তাব আমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। মূল পাণ্ডুলিপিগুলোই চাই আমার।'

'না, আমার চাই,' মার্জিত ইংরেজিতে বলল কেউ। 'আরও চাই টপ সিক্রেট ডকুমেন্টটা।'

লোকটা সেই তালগাছ, জর্জিক জোডা। ঠিক তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ডুপ্লিকেট কার্বন কপি, কার্চিক জোডা। ভাইয়ের সঙ্গে তফাৎ, ক্ষতচিহ্নটা তার গালে নয়, গলায়। কমপ্লিট কালো সুট পরেছে সে, দেখতে একজন কূটনীতিকের

মতই লাগছে। ঝট করে পিছন দিকে ঘাড় ফেরাল ফোলি। ব্যাগ থেকে হাত বের করে বিলিয়ার্ডও ধীরে ধীরে তাকালেন। দুই জোডার হাতে দুটো মেশিন পিস্তল।

'আমি জানতাম আবার আমাদের দেখা হবে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। 'তবে এত তাড়াতাড়ি বা এখানেই দেখা হবে তা ভাবিনি।'

'চিঠি লিখে আমিই তোমাকে জানিয়েছি,' ভারী গলায় বলল ছোট জোডা। 'তোমার কাছে একটা ওয়ালথার আছে, রানা। ওটা বের করে টেবিলের ওপর রাখো।' ফোলির দিকে তাকাল। 'আপনার রাইফেলটাও ওয়ালথারের পাশে রাখুন।' সবশেষে বিলিয়ার্ডকে বলল, 'কাঁধের ব্যাগ আর হাতের রিভলবার রাইফেলের পাশে রাখবেন।'

কেউ এক চুল নড়ল না।

কর্কশ শব্দে হেসে উঠল কার্চিক জোডা। ভাইকে সরিয়ে দিয়ে দোরগোড়া থেকে এক পা সামনে বাড়ল সে। 'আমাকে খুন করার সুযোগ দিচ্ছ?' মেশিন পিস্তলের ট্রিগারে চেপে বসছে তার আঙুল।

এবার বিলিয়ার্ড নড়ে উঠলেন। হাতের কোল্ট আর কাঁধের ব্যাগ টেবিলের ওপর রাখলেন তিনি।

ফোলিকে রানা আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখল। জোডার দৃষ্টি নিজের দিকে ফেরাবার জন্যে ওয়ালথারটা বের করে ঠকাস করে টেবিলে রাখল ও, বলল, 'আমারই ভুল—আগেই তোমার একটা ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।' কিন্তু তাতে কাজ হলো না। রাইফেলটা ঘোরানো শেষ করতে পারল না ফোলি, তার আগেই মাথায় গুলি করল কার্চিক জোডা। এত কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে, ফোলির মাথার অর্ধেকই স্রেফ উড়ে গেল।

জোডা নাগালের মধ্যেই রয়েছে, ফলে রানা ও বিলিয়ার্ড তাকে ধরার চেষ্টা করল। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল কার্চিক জোডা, মেশিন পিস্তল ঘুরিয়ে লক্ষ্যস্থির করল নোভার মাথায়। 'সম্ভবত এক পশলা গুলিতে তিনজনকেই শেষ করে দিতে পারি, তবে প্রথম কয়েকটা বুলেট নোভাকেই লাগবে।'

স্থির হয়ে গেল রানা ও বিলিয়ার্ড। জোডা আর ওদের মাঝখানে পড়ে রয়েছে ফোলি—ওদের পায়ের কাছে এখনও সামান্য ঝাঁকি খাচ্ছে, তবে বেঁচে নেই। পা দিয়ে টেনে রাইফেলটা দরজার বাইরে ফেলে দিল কার্চিক জোডা। সাবধানে এগোল তার ভাই। টেবিল থেকে কোল্ট আর ওয়ালথারটা নিয়ে কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল। সবশেষে হাত বাড়াল ব্যাগটার দিকে। তার চোখ ও মেশিন পিস্তল সারাক্ষণ ওদের দিকেই তাক করা। 'ডকুমেন্টটা কোথায়?'

'তোমরা আমাদেরকে পেলে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জেমস ফোলি আর ম্যাক বিলিয়ার্ডকে অনুসরণ করে। আমি জানতাম, ওরা তোমাকে ঠিকই খুঁজে পাবে।' হাসছে কার্চিক।

সময় পাবার চেষ্টা করছে রানা। বিলিয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কিভাবে জানলেন আমরা এখানে আছি?' ভাবছে, সুজায়েভের কোন বিপদ হয়নি তো?

বিলিয়ার্ড বললেন, 'অনেক বছর আগেই মুর্তজায়েভ আমাকে জানিয়েছিলেন

নিকোলাই সুনজাককে বাডভায় কবর দেয়া হয়েছে। কবরটা চিনতাম না, তবে কবরস্থানটা কোথায় জানতাম। আপনারা বাডভায় আসছেন, এটা জানতে পেরেই ধরে নিই মুর্তজায়েভ তাঁর পাণ্ডুলিপি ও ডকুমেন্ট সুনজাকের কবরেই লুকিয়ে রেখেছেন। নোভাদের খামার বাড়িতে খোঁজ করে আপনাদেরকে পেলাম না। কবরস্থানে ঢুকে দেখলাম একটা কবর খানিকটা খোঁড়া হয়েছে। তখনই সন্দেহ হলো, আপনারা নিশ্চয়ই পাহাড়ের ঢালে রাখালদের কুঁড়েতে আছেন।'

'এখানে আমি গল্পগুজব করতে আসিনি,' হুমকি দেয়ার সুরে বলল কার্চিক জোডা। 'রানা, নামাজ পড়ো তো? পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ো। মি. বিলিয়ার্ড, আপনিও। প্রতিটা নির্দেশ আমি শুধু একবারই দেব। ভাল কথা, কেউ যেন না ভাবে ডকুমেন্টটার কথা ভুলে গেছি আমি। এই ঘরেই কারও কাছে আছে ওটা, সার্চ করলেই বেরিয়ে পড়বে।'

হাঁটু ভাঁজ করে বসল ওরা, হলুদ মগজ সহ রক্তাক্ত ফোলির মাথা রানার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে।

'এবার, কচি, তোমার পালা,' নোভাকে বলল কার্চিক জোডা। পকেট থেকে এক প্রস্থ নাইলন কর্ড বের করে ছুঁড়ে দিল টেবিলের দিকে। 'বাঁধো ওদেরকে। শক্ত হওয়া চাই, আমি পরীক্ষা করব। যদি দেখি কোন রকম চালাকি করেছ, তোমার একটা স্তন কেটে নেব ব্লেড দিয়ে।'

মেশিন পিস্তল রানা আর বিলিয়ার্ডের মাথা লক্ষ্য করে ধরে আছে দুই ভাই। ভয়ে ও অপমানে থরথর করে কাঁপছে নোভা।

কার্চিক নির্দেশ দিচ্ছে। 'হাতগুলো পিছনে টেনে নাও, পিঠের ওপর। তারপর পায়ের গোড়ালি হাতের সঙ্গে এক করো।' কান্না চেপে রাখায় নোভার কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল। তবে জোডার নির্দেশ মত কাজ শুরু করল সে। 'আবার বলছি, শক্ত করে বাঁধবে, কর্ড যেন মাংসে ডেবে যায়।'

রহস্যটা রানা ধরতে পারছে না। গুলি করে চলে গেলেই তো পারে জোডা। লাশগুলোর হাত-পা বাঁধা হতে হবে কেন? তারপর রানা ভাবল, সুজায়েভ কি ঠিক এক ঘণ্টা পার করেই ফিরবে? সেক্ষেত্রে আরও অন্তত পঁচিশ মিনিট সময় নেবে সে। ফিরলেই বা কি, সে তো নিরস্ত্র। রাইফেলটা অবশ্য দরজার বাইরে পড়ে রয়েছে। কিন্তু সুজায়েভ কি রাইফেল চালাতে জানে? 'নোভার একটা প্রশ্ন আছে, জোডা,' বলল রানা। নোভা বিলিয়ার্ডের হাত-পা এক করে বাঁধছে, হাত কাঁপায় কাজটায় সময় লাগছে। 'এ-কথা কি সত্যি যে ওর বাবাকে তুমিই খুন করেছিলে?'

নাটকীয় ভঙ্গিতে, বিনয়ের অবতার সেজে, কুর্নিস করার আদলে সসম্মানে অভিবাদন জানাল কার্চিক জোডা। 'হ্যাঁ, কৃতিত্বটা এই অধম বান্দারই। যদি জিজ্ঞেস করো কেন, তাহলে বলব পার্টি ও দেশের স্বার্থে ওটা ছিল আমার পবিত্র দায়িত্ব। সুনজাক মূল দলে থেকে গেলে কি হবে, মন্ট্রিনিগ্রোকে স্বাধীন করার শপথ নিয়েছিল সে, তলে তলে মুর্তজায়েভের দলে যোগ দেয়ার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিল।'

'তুমি বলতে চাইছ ব্যক্তিগত কোন কারণ ছিল না?'

কদর্য হাসি ফুটল জোডার মুখে। 'একেবারে ছিল না, তাই বা বলি কি করে!

ছোটবেলায় নোভার মায়ের সঙ্গে এক সঙ্গে খেলেছি। তার প্রতি আমার একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। একবার একটা সাপ তাড়া করেছিল, সেটাকে মেরে আমি তাকে বাঁচাই। আরেকবার নদীতে ডুবে যাচ্ছিল, সেবারও আমিই তার প্রাণ রক্ষা করি। তোমরাই বলো, এ-সব কারণে তার প্রতি আমার একটা অধিকার জন্মাল না?'

রানার হাত-পা এক করছে নোভা।

'কিন্তু বড় হবার পর লিলি এমন ভাব দেখাতে শুরু করল, সে যেন আমাকে চেনেই না,' আবার শুরু করল জোডা। 'তারপর সে আমাকে কাঁচকলা দেখিয়ে সুনজাককে বিয়ে করল। অর্থাৎ আমার ভেতর আগুনটা আরও উসকে দিল সে।'

রানার হাত-পা বাঁধছে নোভা, কিন্তু তাকিয়ে আছে জোডার দিকে। ফিসফিস করল রানা, 'নোভা, তোমার লুগারটা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দাও।' কিন্তু আতঙ্কিত নোভা শুনেছে বা উপলব্ধি করেছে বলে মনে হলো না, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে জোডার দিকে।

'বিয়ে হবার পরও লিলির ওপর আমি আমার অধিকার কায়েম করার চেষ্টা করেছি,' বলে যাচ্ছে জোডা। 'কিন্তু সে আমাকে পাত্তাই দিল না। ভেবে দেখলাম, সুনজাক যতদিন বেঁচে আছে, আমার কথায় কান দেবে না লিলি।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তারপর? হ্যাঁ, তারও পর আছে। ক্যান্সারে মারা গিয়ে লিলি আমাকে ফাঁকি দিল। কিন্তু আমার ভেতর যে আগুনটা সে জ্বেলে দিয়ে গেছে সেটা তো নিভল না। তাই প্রতিজ্ঞা করলাম, লিলিকে পাইনি তো কি হয়েছে, লিলির মেয়েকে ঠিকই আমি একদিন ধরব।' হাহ্-হাহ্ করে গা রিরি করা হাসিতে ফেটে পড়ল সে। 'লিলির মেয়ে এই নোভা, কচি লিলি, এখন আমার হাতের মুঠোয়।'

রানার হাত-পা বেঁধে সিধে হলো নোভা। থমথম করছে তার চেহারা, তবে কাঁপুনিটা বন্ধ হয়ে গেছে। সে সিধে হতেই ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডাকল জোডা। টেবিল ঘুরে তার দিকে এগোল নোভা, হাত দুটো কোটের পকেটে। বাম হাত দিয়ে তার একটা স্তন ধরল জোডা। 'এ তোমার নিয়তি, নোভা। আমার ভেতর যে আগুনটা তোমার মা জ্বেলে দিয়ে গেছে, এখন সেটা আমাকে নেভাতে হবে।' নোভার চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল সে। মুখ বাড়িয়ে চপ্ করে চুমো খেলো ঠোঁটে, তারপর ঠেলে দিল দূরে। 'কি বলেছি, মনে আছে তো? একই নির্দেশ দু'বার দেব না।' হাত তুলে কামরার একটা কোণ দেখাল, সেখানে এক গাদা খড় পড়ে আছে। 'ওখানে দাঁড়িয়ে কাপড় খোলো। তাড়াতাড়ি। আগুনটা নিভুক, তারপর রানাকে সার্চ করতে হবে।'

নোভা নড়ছে না।

কর্ড বাঁধা হাত দুটো মোচড়াচ্ছে রানা। ঢিল করেই বাঁধা হয়েছে, খুলতে বেশি সময় লাগল না। বাঁধন মুক্ত হয়েও নড়তে পারছে না রানা, তার আগে লুগারটা হাতে পেতে হবে। কিন্তু কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখল, সেটা খালি।

'কি হলো?' মারমুখো হয়ে নোভার দিকে এগোল জোডা। 'লজ্জা পাচ্ছ

নাকি?' আবার চুল ধরে নোভাকে নিজের গায়ের ওপর টেনে আনল সে।

রানা লাফ দেয়ার জন্যে সিধে হতে শুরু করেছে, শুরু হলো বিস্ফোরণ। একটা, দুটো, তিনটে–যতক্ষণ না জোড়া লাগা দুটো শরীর ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হলো। মেশিন পিস্তলটা জোডার আঙুল থেকে খসে পড়ল, দু'হাত দিয়ে বুক আর পাঁজর চেপে ধরল সে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। কোটের পকেট থেকে হাত দুটো বের করেনি নোভা। একটা পকেট থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনও। তার পায়ের কাছে ধপাস করে পড়ে গেল জোডা, পড়ার পর আর নড়ল না।

বিদ্যুৎগতিতে কার্চিকের মেশিন পিস্তল তুলে নিয়ে গুলি করল রানা ওর ভাইকে। ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ধপাস করে পড়ল সে ঘরের বাইরে।

ছুটে এসে রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল নোভা। সেই কাঁপুনিটা শুরু হলো আবার।

এগারো

নোভার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল রানা। এখন আর সে ফোঁপাচ্ছে না। বুক থেকে তাকে ছাড়িয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল ও, হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা তুলে কাঁধে ঝোলাল।

জর্জিক জোডার বেল্ট থেকে ওয়ালথার আর কোল্টটা বের করল রানা। কোল্টটা ধরিয়ে দিল বিলিয়ার্ডের হাতে। 'এখনও এটা আপনার কাজে লাগতে পারে।'

'ধন্যবাদ, মি. রানা।' দরজার বাইরে থেকে ফোলির রাইফেলটাও তুলে আনলেন বিলিয়ার্ড।

ওয়ালথারটা পকেটে রেখে জোডার মেশিন পিস্তলটা নোভার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। 'এটা নোভার কাছে থাকবে, পরে আমার কাজে লাগতে পারে।' বিলিয়ার্ডের দিকে তাকাল ও। 'লাশগুলো এখানে থাকলে নোভা আর সুজায়েভের বিপদ হবে। ফোলির লাশ নিশ্চয়ই আপনি বেলগ্রেডে নিয়ে যেতে চাইবেন, লন্ডনে পাঠাবার জন্যে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'আপনারা বোধহয় বনরক্ষীদের গাড়ি নিয়ে এখানে এসেছেন?'

বিলিয়ার্ড মাথা নাড়লেন। 'না, পডগোরিকা থেকে ডিপ্লোম্যাটিক প্লেট লাগানো একটা পাজেরো নিয়ে এসেছি।'

'কিন্তু আমার জানামতে, মিলোসেভিচের জঙ্গলে প্রাইভেট কোন গাড়ি ঢুকতে দেয়া হয় না।'

'আমরা ডিপ্লোম্যাট, মি. রানা,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'শিকারে বেরুলেও ছোটখাট বার আর হিটার দরকার হয় আমাদের। বনরক্ষীদের গাড়িতে কি এ-সব

থাকে?'

'ওই গাড়িটা কাল বিকেলে বা পরশু পডগোরিকায় আমার দরকার হতে পারে, পাব কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সাঈদ মুর্তজায়েভের উপকার হলে আরও বড় ধরনের সাহায্য করতেও আমার আপত্তি নেই,' বললেন বিলিয়ার্ড।

'গাড়িটার যদি কোন ক্ষতি হয়,' বলল রানা। 'তার ক্ষতিপূরণ অবশ্যই পাবেন আপনারা। পরে যাতে কোন ঝামেলা না হয়, পুলিসকে জানাবেন ওটা চুরি হয়ে গেছে। তবে থানায় খবরটা দেবেন গাড়িটা আমার হাতে আসার অন্তত বারো ঘণ্টা পর।'

বিলিয়ার্ড মাথা ঝাঁকালেন। 'তাই হবে।'

'এবার বলুন, এখানে কি আপনারা শিকার করতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে লিখিত অনুমতি নিয়ে,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'একটানা সাতদিন এখানে আমরা থাকতে পারব। সেজন্যেই ফোলির করুণ পরিণতি ব্যাখ্যা করতে আমার কোন অসুবিধে হবে না। অন্ধকার জঙ্গলে কাউকে নড়াচড়া করতে দেখে চ্যালেঞ্জ করে ফোলি, জবাবে মেশিন পিস্তল দিয়ে তাকে গুলি করে কার্চিক জোড়া। টর্চের আলোয় তাকে আমি দেখতে পাই, কিন্তু ধরতে পারিনি। ফোলিকে খুন করে সে গা ঢাকা দিয়েছে।'

'কিন্তু ওদের লাশ?'

'ওদেরকে এখানেই কোথাও পুঁতে ফেলতে হবে। ওদের আমরা কেউ দেখিনি।'

'তবে কবরস্থানে নয়,' বলল রানা। 'জঙ্গলের কোন গোপন জায়গায়।' হাতঘড়ি দেখল। 'আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবে সুজায়েভ। নোভা, দায়িত্বটা তাকে দেয়া যায়?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল নোভা।

'সুজায়েভ দুই জোড়াকে পুঁতে হাফ-ট্রাক নিয়ে একাই ফিরে যাবেন কোটরে,' বলল রানা। 'মি. বিলিয়ার্ড, আপনি আমাকে পডগোরিকা পর্যন্ত লিফট দিতে পারবেন তো? আমার ইচ্ছা ডকুমেন্টের একটা কপি আপনার কাছেও থাকুক।'

'কেন পারব না।'

'আরেকটা কথা, মি. বিলিয়ার্ড। ফোলির মৃত্যু সংবাদ কি চব্বিশ ঘণ্টা গোপন রাখা সম্ভব? প্লীজ, কারণটা জানতে চাইবেন না।'

চিন্তামগ্ন হলেন বিলিয়ার্ড। প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড পর মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'সম্ভব।'

নোভার দিকে তাকাল রানা। 'আগের প্ল্যান একটু বদলাতে হচ্ছে, নোভা। এখানে তিনটে লাশ পড়েছে, কাজেই বাড়ভায় তোমার না থাকাই উচিত। একসঙ্গেই চলো, তোমাকে আমরা কোটরে নামিয়ে দেব। ঠিক আছে?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল নোভা।

'মি. বিলিয়ার্ড, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। ভাল কথা, আজ রাতে তো কোন ফ্লাইট নেই, ফোলির লাশ নিয়ে আপনি সম্ভবত কাল সকালের ফ্লাইটে

বেলগ্রেডে ফিরবেন?'

মাথা নাড়লেন বিলিয়ার্ড। 'চার্টার করা প্লেনটা আমাদের জন্যে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে।'

'ওই প্লেনে আমার ফেরা চলে না,' বলল রানা। 'আমি পডগোরিকায় রাত কাটিয়ে কাল সকালের ফ্লাইটে বেলগ্রেডে ফিরব।'

রানা থামতেই দোরগোড়ায় হাজির হলো সুজায়েভ। অনেক দূর থেকে দৌড়ে আসায় ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। 'খামারবাড়িতে আপনাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করছিলাম, গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে এসেছি। কি হয়েছে, এরা কারা?'

'আপনি কিছু শোনেননি, আপনি কিছু দেখেননি,' বলল রানা। 'যে-ই প্রশ্ন করুক, আপনি কিছুই জানেন না। ঠিক আছে?'

বোবা হয়ে গেল সুজায়েভ। ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল।

'গাড়িটা লুকিয়ে রেখেছেন তো?'

আবার মাথা ঝাঁকাল সুজায়েভ।

'গুড। আমরা চলে গেলে এই লাশ দুটো,' ইঙ্গিতে কার্চিক জোড়া আর তার ভাইকে দেখাল রানা, 'জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে পুঁতে ফেলবেন। সাবধান, কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। পারবেন?'

'জ্বী।'

'আপনাকে যে আয়োজন করার দায়িত্ব দিয়েছি, তা কাল বিকেলের মধ্যে শেষ করা দরকার। সম্ভব?'

'জ্বী, সম্ভব।'

'হাফ-ট্রাক ধার করে আনলেন, রাস্তায় ট্রাক দাঁড় করিয়ে আপনার লোক রোড ব্লক তৈরি করল, এ-সব কারণে আপনাকে কি বিপদে পড়তে হবে?'

'যে ট্রাকটা রোড ব্লক তৈরি করেছে সেটা চুরি করা। কে চুরি করেছে তার আমি কি জানি। আর এই হাফ-ট্রাক নিয়েই সব সময় কোটর থেকে বাড়ভায় আসি আমি, বনরক্ষীরা সবাই তা জানে, কাজেই কেউ আমাকে কোন ব্যাপারে জড়াতে পারবে না।' সুজায়েভ হাসছে।

'ভেরি গুড। আমরা অন্য একটা গাড়ি নিয়ে এখুনি ফিরে যাচ্ছি। আমরা চলে গেলেই আপনি লাশের ব্যবস্থা করবেন। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আবার আমাদের দেখা হবে।'

কুঁড়ে থেকে সবাই বেরিয়ে আসছে, রানার হাতে একটা এনভেলাপ গুঁজে দিল সুজায়েভ। কোন প্রশ্ন না করে সেটা পকেটে রেখে দিল রানা।

বেলা একটায় বেলগ্রেড পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে সাঈদ মুর্তজায়েভকে ফোন করল রানা। আশ্চর্যই বলতে হবে, রানার সঙ্গে কথা বলতে তিনি বেশি উৎসাহ দেখালেন না। অনেকটা জেদের সুরেই বললেন, 'মি. রানা, রিসিভারটা আপনি ড. সিডাককে দিন, যা বলার সরাসরি তাঁকেই বলব আমি।'

'উনি আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি নন,' মুখ ভার করে ড. সিডাককে বলল রানা। 'বলছেন, যা বলার আপনাকেই বলবেন।'

রিসিভার নিয়ে পুলিস চীফ বললেন, 'হ্যালো, সাঈদ? কেমন আছ তুমি?'

অপরপ্রান্তে কথা বলছেন সাঈদ মুর্তজায়েভ, মনোযোগ দিয়ে শুনছেন ড. সিডাক। মাঝে মধ্যে হুঁ-হ্যাঁ করছেন। একবার বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাই হবে।' তারপর বললেন, 'এখুনি? ঠিক আছে, আসছি...' রিসিভার রেখে দিলেন তিনি, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ।

'কি কথা হলো?'

'হাজার হোক এক সময় তো আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলাম, তাই না? পাণ্ডুলিপি আর ডকুমেন্টটা আমার হাতেই তুলে দিতে চাইছে সে। আল্লার কসম খেয়ে বলল, ডকুমেন্ট সে পড়েনি। চলুন, বেরিয়ে পড়ি।'

'আমাকেও তাহলে যেতে হবে?' রানা ইতস্তত করছে।

'সাঈদ বলছে, ওগুলো সে আপনার সামনে হস্তান্তর করতে চায়। বলছে, বিদেশী একজন লোক সাক্ষী থাকলে ভাল হয়।'

কথা আর না বাড়িয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা। 'বেশ, চলুন তাহলে।'

পুলিস চীফ আসছেন, এ-খবর টেলিফোনে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে বাড়ির গার্ডরুমকে। গেটে জীপ থামতে ছুটে এসে স্যালুট করল সশস্ত্র গার্ডরা। ড্রাইভিং সীট থেকে ড. সিডাক জানতে চাইলেন, 'ঠিকমত পাহারা দিচ্ছ তো? টহলে কোন অবহেলা হচ্ছে না?'

'জী, স্যার, ঠিকমত পাহারা দিচ্ছি। জী-না, স্যার, কোন রকম অবহেলা করা হচ্ছে না। একটা পিঁপড়ে গললেও আমরা জানতে পারব।'

'বাড়িতে এই মুহূর্তে কে কে আছেন?'

'সবাই আছেন, স্যার—মি. মুর্তজায়েভ, তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলেমেয়ে।'

জীপ ছেড়ে দিলেন ড. সিডাক। গার্ডরা আবার তাঁকে স্যালুট করল। পুলিস চীফের পাশের সীটে চুপচাপ বসে আছে রানা।

গার্ডরা গেট থেকেই দেখতে পেল, জীপটা উঁচু বারান্দার সামনে পৌঁছে থামল। জীপ থেকে নেমে ধাপ বেয়ে ওপরে উঠছেন তাদের চীফ, ঘরের ভেতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন সাঈদ মুর্তজায়েভ। করমর্দন নয়, ড. সিডাককে আলিঙ্গন করলেন তিনি। দৃশ্যটা দেখে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস শুরু করল গার্ডরা।

মেহমানদের আজ বারান্দায় না বসিয়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন গৃহবন্দী কবি ও রাজনীতিক। এটাও গার্ডদের মধ্যে একটা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল।

বিশ মিনিট পর জীপটাকে ফিরে আসতে দেখল ওরা। আগের মতই ড্রাইভিং সীটে বসে আছেন ড. সিডাক, পাশে মাসুদ রানা। তবে আরোহীর সংখ্যা বেড়েছে। জীপের পিছনের সীটগুলোয় বসেছেন মিসেস ফাতেমা মুর্তজা আর তাঁর দুই ছেলেমেয়ে—মেয়েটার বয়স সাত, ছেলেটার পাঁচ।

গেটে আবার জীপ থামালেন ড. সিডাক। গার্ডরা স্যালুট করল। হাত তুলে সাড়া দিলেন পুলিস চীফ, তবে ওদের দিকে তাঁর মনোযোগ নেই। জীপে রেডিও ফোন আছে, মাউথপীসটা মুখের সামনে তুলে হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে দ্রুত কথা

বলছেন তিনি। গার্ডরা জীপের পাশে দাঁড়িয়ে শুনছে।

'মি. মুর্তজায়েভ জানালেন, পাণ্ডুলিপি ও ডকুমেন্ট মন্ট্রিনিগ্রোয় আছে। কোথায় আছে তা শুধু তাঁর স্ত্রী জানেন। কাজেই মিসেস ফাতেমাকে নিয়ে এয়ারপোর্টে যাচ্ছি আমি, তোমরা পরবর্তী ফ্লাইটের পাঁচটা সীট বুক করো। হ্যাঁ, মিসেস ফাতেমার সঙ্গে তাঁর দুই ছেলেমেয়েও আছে। পরবর্তী ফ্লাইট দেরি হলে একটা প্লেন চার্টার করো, ঠিক আছে? দিস ইজ অ্যান ইমার্জেন্সী।'

হেডকোয়ার্টার থেকে কয়েকটা প্রশ্ন করা হলো।

ড. সিডাক সেগুলোর জবাবে বললেন, 'পডগোরিকা এয়ারপোর্টে আমাদের অন্তত দু'জন লোককে থাকতে বলবে, একটা জীপ নিয়ে। সাবধান, আমার যাবার খবর যেন লিক না হয়। হ্যাঁ, সম্ভব হলে আজ রাতেই আমি বেলগ্রেডে ফিরে আসব। আর একজন? উনি ব্রিটিশ পাবলিশার, মাসুদ রানা। মি. মুর্তজায়েভের পাণ্ডুলিপিতে আপত্তিকর কিছু না থাকলে ওগুলো তিনি লন্ডন থেকে প্রকাশ করতে চান। সেজন্যেই আমার সঙ্গে থাকতে চাইছেন তিনি...না, পডগোরিকায় যারা জীপ নিয়ে থাকবে তাদেরকে বলার দরকার নেই যে আমি যাচ্ছি...না, বেলগ্রেড এয়ারপোর্টেও কারও থাকার দরকার নেই। রাখলাম।'

এতক্ষণে গার্ডদের দিকে তাকালেন ড. সিডাক। 'পাহারা আরও জোরদার করো তোমরা। মি. সাঈদ পালাবার চেষ্টা করলে আমি একটুও অবাক হব না।'

'জ্বী, স্যার।'

জীপ ছেড়ে দিলেন ড. সিডাক।

এয়ারপোর্টে ভিআইপি ট্রীটমেন্ট পেল ওরা। সরকারী এভিয়েশন ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান স্বয়ং ড. সিডাককে বিশেষ অভ্যর্থনা জানালেন। দক্ষতার সঙ্গে সুষ্ঠু আয়োজন করা হয়েছে, কোন রকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই চার্টার করা প্লেনে তুলে দেয়া হলো ওদেরকে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আকাশে ডানা মেলল রাশিয়ার তৈরি প্যাসেঞ্জার প্লেন টুপোলভ।

দুপুর দুটোয় রওনা হয়ে বিকেল পাঁচটায় পডগোরিকা এয়ারপোর্টে নামল প্লেন। টারমাক ধরে ছুটে এল পুলিসের একটা জীপ, তাতে সাদা পোশাক পরা দু'জন পুলিস অফিসার বসে আছে; জীপে পডগোরিকা এয়ারপোর্টের এয়ার কন্ট্রোলারও উপস্থিত। ওরা প্লেন থেকে নামতে তিনিই অভ্যর্থনা জানালেন, সবিনয়ে জীপে উঠতে অনুরোধ করলেন। পুলিস অফিসাররা চীফকে চিনতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেল। চোখ রাঙিয়ে ড. সিডাক তাদেরকে সাবধান করে দিলেন, 'এটা আমার সারপ্রাইজ ভিজিট, গোপন একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছি, খবরটা যেন জানাজানি না হয়। পডগোরিকার শপিং মল...কি যেন নাম?'

'মেসট্রোভিচ।'

'হ্যাঁ, ওখানে আমাদেরকে নামিয়ে দেবে তোমরা।'

এয়ার কন্ট্রোলার বললেন, 'অতিরিক্ত একটা গেট খুলে রাখা হয়েছে, মি. সিডাক, স্যার। গার্ডদের বলা আছে, আপনাদের জীপ তারা থামাবে না।'

'ধন্যবাদ।'

পুলিস অফিসারদের একজন ড্রাইভিং সীটে বসেছে। ড. সিডাক বলতে যা দেরি, জীপ ছেড়ে দিল সে।

শপিং মলের সামনে পৌঁছাতে পনেরো মিনিট লাগল। জীপ থেকে নেমে একটা চীনা রেস্তোরাঁর দিকে এগোলেন ড. সিডাক, বাকি সবাই তাঁর পিছু নিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে রানা। রাস্তার ওপারেই পার্কিং এরিয়া। সেদিকে তাকাতেই হলদেটে মাখন রঙা পাজেরো জীপটা দেখতে পেল। নিজের অজান্তেই পকেটে হাত বুলিয়ে একটা চাবির অস্তিত্ব অনুভব করল ও। পাজেরোর জানালা-দরজায় টিনটেড কাঁচ, ভেতরটা দেখার কোন উপায় নেই।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পুলিস অফিসারদের দিকে ফিরলেন ড. সিডাক। 'সোজা নিজেদের কাজে ফিরে যাও। আমি পডগোরিকায়, এ গল্প কারও সঙ্গেই করবে না, এমন কি স্ত্রীর সঙ্গেও নয়। মনে থাকবে?'

স্যালুট ও উত্তর একযোগে দিল অফিসাররা, 'জ্বী, স্যার।' পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে করতে জীপ নিয়ে চলে গেল তারা।

রেস্তোরাঁয় বসে খাবারের অর্ডার দেয়া হলো, সব প্যাকেট করে দিতে হবে। বিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো এখানে। এই সুযোগে ড. সিডাক কোটরে একটা ফোন করলেন। প্রথমে নোভার কুশল জানতে চাইলেন তিনি, তারপর জরুরী কয়েকটা নির্দেশ দিলেন। অপরপ্রান্তে বিমূঢ় নোভাকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। খাবারের প্যাকেট পাবার পর বিল মিটিয়ে আবার তিনি মিছিল নিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলেন, জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পেরুচ্ছেন। পৌনে ছ'টা বাজে, সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। বিপদসঙ্কুল পাহাড়ী রাস্তা ধরে কোটরে পৌঁছতে ওদের রাত হয়ে যাবে। দিনের বেলা পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পেরুতে সময় লাগে দু'ঘণ্টা, অন্ধকারে আরও বেশি লাগবে।

হাতে টর্চ, ইঁট বিছানো রাস্তা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে নোভা। আশপাশে কাউকে দেখা না গেলেও, সে একা নয়। বনরক্ষী বা অন্য কেউ দেখে ফেলবে, এই ভয়ে টর্চটা একবারও জ্বালছে না সে। অন্ধকারে মশার কামড় খাচ্ছে, তবু এক চুল নড়ছে না। উদ্বেগ আর উত্তেজনা অসুস্থ করে তুলছে তাকে। রিস্টওয়াচের আলোর বোতাম টিপে ডায়ালের দিকে বারবার তাকাচ্ছে সে। আটটা বেজে বারো মিনিট।

পাকা রাস্তার বাঁকটা নোভার কাছ থেকে দুশো গজ পিছনে। বাঁক থেকে তিনশো গজ দূরে বনরক্ষীদের ছাউনি। সব মিলিয়ে পাঁচশো গজ দূরত্ব, তারপরও তাদের চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসছে। অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠল নোভা। মনে হাজারটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, একটারও উত্তর জানা নেই তার। সে শুধু জানে সিডাক আঙ্কেল আসছেন। কিন্তু কেন আসছেন তা জানে না। তাঁর সঙ্গে রানাও কি থাকবে? ওকে কি গ্রেফতার করা হয়েছে? আজ সকালেই বেলগ্রেডে ফিরে গেছে রানা, আজই সন্ধ্যায় সিডাক আঙ্কেল আসছেন–দুটো ঘটনার সঙ্গে নিশ্চয়ই একটা যোগাযোগ আছে।

বনরক্ষীরা হঠাৎ এমন যুদ্ধংদেহি হয়ে উঠল কেন?

পডগোরিকার দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। আড়ষ্ট হয়ে গেল নোভা। গাড়ির শুধু হেডলাইট দেখা যাচ্ছে, অন্য কিছু নয়। বাঁক নিয়ে ইঁট বিছানো রাস্তায় চলে এল গাড়িটা। তারপর রাস্তা ছেড়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গলের ভেতর। ঝোপ-ঝাড় ভেঙে ইউ টার্ন নিল, দাঁড়িয়ে পড়ল পাকা রাস্তার দিকে মুখ করে। স্টার্ট বন্ধ করল ড্রাইভার। উজ্জ্বল হেডলাইট নিভে গেল।

অন্ধকার আবার গাঢ় হয়ে উঠল। ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। গাড়ির ভেতর থেকে ওরা কেউ নামেনি।

ঝাড়া এক মিনিট অপেক্ষা করার পর হাতের টর্চটা গাড়ির দিকে তাক করে বোতামটায় পরপর দু'বার চাপ দিল নোভা। উত্তেজনায় দম আটকে রেখেছে।

হেডলাইট জ্বলল, নিভল, আবার জ্বলল, আবার নিভল। খানিকটা স্বস্তিবোধ করল নোভা। টর্চের বোতামে আরও দু'বার চাপ দিল সে। এবার গাড়ির হেডলাইট জ্বলার পর আর নিভল না। গাড়ি থেকে একজনকে নামতে দেখল নোভা। সে-ও এবার ঝোপ থেকে বেরিয়ে এগোল সেদিকে।

গাড়িটা ঝকঝকে একটা মাখন রঙা পাজেরো। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ড. সিডাক। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে নোভা। তারপর সিডাক আঙ্কেলও কয়েক পা এগোলেন। নোভাকে হতচকিত করে দিয়ে আলিঙ্গন করলেন তিনি।

'সিডাক আঙ্কেল, আপনি···'

পাজেরো থেকে নেমে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে রানা। 'ভাল করে দেখো, নোভা—উনি কি সত্যি তোমার সিডাক আঙ্কেল? নাকি তাঁর ছদ্মবেশে অন্য কেউ?'

নিজেকে আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ভাল করে দেখল নোভা। 'তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ, রানা? সিডাক আঙ্কেল, কি ঘটছে আমাকে বলবেন, প্লীজ?'

ড. সিডাক হাসছেন। হাসছে রানাও। ও-ই নোভার প্রশ্নের জবাব দিল। 'আশ্চর্য, নোভা, মি. সাঈদ মুর্তজায়েভকে তুমি চিনতে পারছ না?'

'সাঈদ মুর্তজায়েভ···সাঈদ আঙ্কেল···' থতমত খেয়ে গেছে নোভা।

'কেন, মি. মুর্তজায়েভ আর ড. সিডাক, দু'জনকেই তো খুব কাছ থেকে বছরের পর বছর দেখেছ তুমি, একবারও মনে হয়নি দু'জনের চেহারায় কেমন অদ্ভুত মিল?'

'ওহ্ গড!' যেন হঠাৎ করেই নোভার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। 'হ্যাঁ, ঠিক, সত্যিই তো···আপনি, আপনি সাঈদ আঙ্কেল!' এবার সে-ই ঝাঁপিয়ে পড়ল, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সাঈদ মুর্তজায়েভকে।

নোভার মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন মুর্তজায়েভ। নিঃশব্দে কাঁদছেন তিনি।

হঠাৎ ছিটকে দূরে সরে এল নোভা। 'আঙ্কেল, রানা—এদিকের পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। হঠাৎ কিছু একটা হয়েছে, বনরক্ষী আর পুলিস গিজগিজ করছে ছাউনিতে। বাডভায় যাবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে ওরা। শহরের

লোকদের বলে দেয়া হয়েছে, কেউ যেন ভুলেও পাঁচিলের বাইরে না বেরোয়। অন্ধকার গাঢ় হবার পর পাঁচিল টপকে বেরিয়ে এসেছি আমি···

'সর্বনাশ!' চশমা খুলে রুমাল দিয়ে কাঁচ মুছলেন মুর্তজায়েভ। 'এত তাড়াতাড়ি ওরা খবর পেল কিভাবে, রানা?'

'আমি জানি কি ঘটেছে,' বলল রানা। 'সন্ধের পরও আপনার বাড়িতে আলো জ্বলতে না দেখে গার্ডদের সন্দেহ হয়, ভেতরে ঢুকে হাত-পা বাঁধা আর মুখে টেপ লাগানো পুলিস চীফকে দেখতে পেয়েছে ওরা। মুক্ত হবার পর সঙ্গে সঙ্গে রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করেছেন ড. সিডাক। ছাউনিতে ফোন আছে, কাজেই খবরটা পেতে এদের দেরি হয়নি।'

'আমরা তাহলে কোটরে এখন যাব কিভাবে?' মুর্তজা জানতে চাইলেন।

নোভা ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, 'কোন মতেই যাওয়া সম্ভব নয়। কোটরে যাবার এই একটাই রাস্তা, সেটা বন্ধ করে দিয়েছে ওরা।'

'কিভাবে বন্ধ করেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রাস্তার ওপর পাশাপাশি বিশ-বাইশটা খালি তেলের ড্রাম খাড়া করে রেখেছে,' বলল নোভা। 'ওগুলোর পিছনে স্টেনগান আর পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বনরক্ষী ও পুলিস।'

'হুম।' কি যেন চিন্তা করল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'বুঝলাম একটাই রাস্তা, কিন্তু আমরা যদি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা তৈরি করে নিই? এভাবে খানিক দূর যাবার পর পাকা রাস্তায় উঠলাম?'

'না, তাও সম্ভব নয়,' বলল নোভা। 'ফোন পাবার পর আমি দুর্গে উঠেছিলাম। ওরা বোধহয় সন্দেহ করছে জঙ্গল দিয়ে কেউ কোটরে যাবার চেষ্টা করতে পারে, কারণ দেখলাম জঙ্গলের ভেতর টর্চ নিয়ে টহল দিচ্ছে বনরক্ষীরা।'

রানা বলল, 'মি. মুর্তজা, বনরক্ষীরা জানে নকল ড. সিডাক পডগোরিকা পুলিসের একটা জীপ নিয়ে আসবেন। কিন্তু আমরা যাব পাজেরো নিয়ে। পাজেরোয় ডিপ্লোম্যাটিক প্লেট আছে। প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে দেয়া শিকার করার অনুমতি-পত্রটাও আছে। ধরুন, ড্রাইভিং সীটে আপনি বসে থাকবেন। ওরা দেখবে গাড়ি চালাচ্ছেন চকচকে টাক মাথা, দাড়ি-গোঁফ কামানো, চশমাবিহীন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। এমন কি হতে পারে না, এ-সব দেখে ব্যারিকেড সরিয়ে নেবে ওরা?'

মুর্তজায়েভ খানিক ইতস্তত করে বললেন, 'আমার মনে হয় ফিফটি-ফিফটি চান্স।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা। 'নোভা, তোমাকে ফোনে ব্লেড, কাঁচি আর রেজার আনতে বলা হয়েছিল, এনেছ?'

'হ্যাঁ, এনেছি, কিন্তু···'

'সুজায়েভ আসেননি? তোমার হাতে ব্রিফকেসটাও তো দেখছি না।'

'সুজা আঙ্কেল আড়াল থেকে কাভার দিচ্ছেন আমাকে। ব্রিফকেসটা তাঁর কাছে আছে,' বলে ওদের দিকে পিছন ফিরল নোভা, একটা ঝোপ লক্ষ্য করে টর্চের বোতামে পরপর দু'বার চাপ দিল।

একটু পরই দেখা গেল ভারী ব্রিফকেসটা নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে সুজায়েভ। মুর্তজায়েভের আপন ভগ্নিপতি, সে-ই মাথাটা মোড়াল তাঁর। দাড়ি-গোঁফ অবশ্য নিজেই কামালেন তিনি। ইতিমধ্যে চকলেট রঙের ব্রিফকেস খুলে অস্ত্র ও গোলাবারুদ কোটের বিভিন্ন পকেটে ভরে ফেলেছে রানা। লুগারটা নোভার কাছে ছিল, সেটা চেয়ে নিল। ওয়ালথারটা ফিরিয়ে দিল তাকে। সুজায়েভের কাছ থেকে মেশিন পিস্তলটাও চেয়ে নিল রানা। সব শেষে পকেট থেকে মাইক্রোফিল্মের একটা অতিরিক্ত কপি বের করল, নোভার হাত ধরে সরে এল একটা ঝোপের আড়ালে। 'নোভা, এখনও সময় আছে, আমি অনুরোধ করছি, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।'

'না, তা হয় না, রানা!' বিড়বিড় করল নোভা। 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, এখানে আমার অনেক কাজ।'

'মাইক্রোফিল্ম পেলেও ড. সিডাক খুব একটা সন্তুষ্ট হবেন বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'কারণ দু'দিন পর হলেও তিনি জানতে পারবেন, আরও কপি ছিল, জাতিসংঘের হাতে তা পৌঁছেও গেছে। তাঁকে বোকা বানাবার জন্যে তোমাকেও তিনি দায়ী ভাবতে পারেন। আমি বলতে চাইছি, যুগোস্লাভিয়া তোমার জন্যে আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তারচেয়ে মন্ট্রিনিগ্রো স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত মুক্তবিশ্বের কোন দেশে থাকলে ভাল হয় না?'

'দেশের লোক স্বাধীনতার জন্যে লড়বে, আর আমি পালিয়ে থাকব? তারপর স্বাধীনতার সুফল ভোগ করার জন্যে ফিরে আসব?' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল নোভা।

'এ-ব্যাপারে আমি তোমাকে জোর করতে পারি না,' বলল রানা। 'তোমার জন্যে প্রার্থনা করব আমরা। এবার তাহলে বিদায় দাও, নোভা।' মাইক্রোফিল্মটা তার হাতে গুঁজে দিল ও।

'আমি কিন্তু সত্যি তোমাকে ডাকব, রানা।' বিদায়ের মুহূর্তে নিজেকে সামলে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল, কান্নাটাকে কোন রকমে গলার কাছে ঠেকিয়ে রেখেছে নোভা। 'সত্যি তুমি আসবে তো, রানা?'

'তুমি ডাকলে ছুটে চলে আসব আমি,' বলল রানা। 'যদি ততদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি।'

'আর আমি যদি মারা যাই?' রানার হাতটা ধরে নিজের গালে চেপে ধরল নোভা। 'তবু তুমি এসো, রানা। হয় বেলগ্রেড, না হয় কোটর থেকে তোমার মূর্তিটা নিয়ে যেয়ো। ফ্ল্যাটে ফিরে এখুনি আমি আমার যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ শুরু করব। তুমি নিরাপদে চলে যেতে পেরেছ, এই খবর না পাওয়া পর্যন্ত কাজ ছেড়ে আমি উঠব না।'

'জানালাটা খোলা রেখো,' বলল রানা। 'যদি দেখো দক্ষিণের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, ধরে নেবে বড় বাধাটা পার হতে পেরেছি আমরা।'

'মানে?'

'এখন সব কিছু ব্যাখ্যা করার সময় নেই, নোভা। আসি, কেমন?'

পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হলো নোভা, রানার গালে ঠোঁট আর নাক ঘষল,

যেন ঘ্রাণ নিচ্ছে। 'সাবধানে থেকো, রানা।'

'তুমিও,' বলে গাড়ির কাছে ফিরে এল রানা। 'সুজায়েভ, আপনাকে যা করতে বলেছিলাম...'

সুজায়েভ নয়, রানাকে থামিয়ে দিলেন মুর্তজায়েভ। 'কোথায় কি আছে সব আমাকে জানিয়েছে সুজা। এখানেই আমার জন্ম, সবই তো চিনি, কাজেই খুঁজে নিতে কোন অসুবিধে হবে না।'

'তাহলে আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়,' বলল রানা। 'সুজায়েভ, আপনার ওপর দায়িত্ব থাকল, নোভাকে নিরাপদে ওর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবেন। পকেট থেকে মাস্টার কার্ড বের করে ধরিয়ে দিল তার হাতে।

'অবশ্যই, মি. রানা।'

মুর্তজায়েভ বললেন, 'তোমরা আগে চলে যাও, তারপর আমরা রওনা হব।'

রানার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল নোভা, নড়ছে না। পরিবেশটা আড়ষ্ট, ভারী হয়ে উঠতে এগিয়ে এল সুজায়েভ, নোভার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। তার কান্নার শব্দ শুনে কাঁপা একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা।

বাঁক ঘুরতেই দূরে দেখা গেল রোড ব্লক। একজোড়া ফ্লাডলাইট দিনের মত আলোকিত করে রেখেছে গোটা এলাকা। হেডলাইট দেখেই বনরক্ষী আর পুলিস দ্রুত বালির বস্তার আড়ালে সরে গেল, স্টেনগানের মাজল অনুসরণ করছে পাজেরোকে। তেলের ড্রামগুলো খালি হলেও, খাড়া করে দু'সারিতে বসানো হয়েছে। রোড ব্লক থেকে বিশ-পঁচিশ গজ সামনে, রাস্তার বাম পাশে, এক সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঁচটা ট্রাক। তারমধ্যে তিনটে হাফ-ট্রাক। বাকি দুটো পাঁচ টনী, ক্যাবের পিছনে লোহার ফ্রেম আছে, তেরপল দিয়ে ঢাকা।

সবাই বালির বস্তার আড়ালে কাভার নেয়নি, ড্রামগুলোর এদিকে পাঁচজন বনরক্ষী আর তিনজন পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অস্ত্রও পাজেরোর দিকে তাক করা।

রোড ব্লক থেকে বিশ গজ দূরে গাড়ি থামালেন মুর্তজা। হাতে পিস্তল নিয়ে বনরক্ষীদের হেড এগিয়ে এল। নিজের দিকের জানালার কাঁচটা নামালেন মুর্তজা, তবে পুরোপুরি নয়। 'রোড ব্লক কেন?' ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন তিনি। চোখের কোণ দিয়ে দেখলেন, একজন বনরক্ষী ও একজন পুলিস গাড়িটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করেছে। উঁকি দিয়ে গাড়ির ভেতরটা দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করছে তারা।

পাজেরোর ব্যাক সীটে বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে, মিসেস ফাতেমা তাদেরকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছেন। রানা বসেছে পাজেরোর বাঁ পাশের অতিরিক্ত একটা সীটে। ওর কোলের ওপর একজোড়া গ্রেনেড পড়ে আছে, হাতে মেশিন পিস্তল।

'ইমার্জেন্সী, স্যার,' বনরক্ষীদের হেড জবাব দিল। 'গোপন রাষ্ট্রীয় দলিল চুরি করে একজন রাষ্ট্রদ্রোহী পালিয়েছে। আমাদের ওপর নির্দেশ আছে, বাডভায় যেন কাউকে যেতে দেয়া না হয়।'

'কিন্তু আমরা তো গত দু'দিন ধরে পডগোরিকা থেকে বাডভায় আসা-যাওয়া

করছি,' মুর্তজা বললেন। 'কই, একবারও তো বাধা দেয়া হয়নি। আমার কাছে প্রেসিডেন্ট ভবনের লিখিত অনুমতি আছে, ইচ্ছে করলে আপনি দেখতে পারেন।'

'তা ঠিক, গাড়িটাকে আমরা দু'তিনবার আসা-যাওয়া করতে দেখেছি,' ইতস্তত করছে হেড। 'এ-ও জানি যে আপনাদের কাছে অনুমতি-পত্র আছে। কিন্তু আগে যা হবার হয়েছে, রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করার পর বাডভায় এখন আমরা কোন গাড়িকে যেতে দিতে পারি না।'

'সেক্ষেত্রে মোবাইল ফোনে প্রেসিডেন্ট ভবনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে আমাকে,' বললেন মুর্তজা। কোলের ওপর থেকে মোবাইলটা হাতে নিলেন। 'বাডভায় আমার বন্ধু অপেক্ষা করছেন, আমি না পৌঁছালে তিনি খুব দুশ্চিন্তা করবেন...'

'আপনার বন্ধু?'

'জাতীয় যুবদলের নেতা–কার্চিক জোডা।'

জোডার নাম শুনে স্পষ্টই বিচলিত হয়ে উঠল হেড। 'এক মিনিট, স্যার,' বলে দু'পা পিছিয়ে গেল সে, সঙ্গীদের সঙ্গে নিচু স্বরে আলাপ করছে। সাতজন আবার এক হয়েছে তারা।

প্রায় পাঁচ মিনিট আলাপ করার পর ফিরে এল হেড। 'ঠিক আছে, স্যার, আপনি যেতে পারেন।' ইঙ্গিতে নিজের লোকদের রোড ব্লক সরিয়ে নিতে বলল সে। 'নেতাকে আমাদের শুভেচ্ছা জানবেন, স্যার। বলবেন তাঁর কোন খবর না পাওয়ায় প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি যেন অবশ্যই টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। আরেকটা কথা, স্যার। বাডভায় তিনি কোথায় আছেন জানেন নিশ্চয়ই?'

'কেন, যেখানে থাকার কথা–সাঈদ মুর্তজায়েভের খামার বাড়িতে।'

এই সময় হেডকে একপাশে ডেকে নিল একজন পুলিস ইন্সপেক্টর। আবার ফিসফাস শুরু হলো। এবার মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে এল হেড, সঙ্গে ইন্সপেক্টর। 'গাড়িতে আপনি ছাড়া আর কে আছেন, স্যার?' জানতে চাইল ইন্সপেক্টর।

'আমার কয়েকজন বন্ধু আছেন, ঘুমাচ্ছেন তাঁরা,' মুর্তজা বললেন।

'আমরা তাঁদের দেখতে চাই, স্যার,' ইন্সপেক্টর হাতের অস্ত্র নেড়ে বলল, 'দরজা খুলুন, প্লীজ। কিছু মনে করবেন না, রুটিন ওঅর্ক–গাড়িটা সার্চও করতে হবে।'

'কি বলছেন! ডিপ্লোম্যাটিক প্লেট লাগানো গাড়ি আপনারা সার্চ করেন কিভাবে!'

ইন্সপেক্টর হাত তুলে বনরক্ষীদের নিষেধ করল, ড্রাম সরানোর কাজ বন্ধ করে দিল তারা। ইতোমধ্যে দুই সারি থেকে মাত্র চারটে ড্রাম সরানো হয়েছে। 'দুঃখিত, স্যার। কিন্তু আমাদের উপায় নেই। ইমার্জেন্সী, কাজেই...' দরজার হাতল ধরে টানাটানি শুরু করল সে।

'ঠিক আছে, জানালা খুলছি,' বললেন মুর্তজা।

সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা মুচড়ে প্যাসেঞ্জার সাইডের একটা জানালা ইঞ্চি পাঁচেক

নামাল রানা, বাইরে একটা হাত বের করে দিয়ে বলল, 'ধরো!' হেড সহ ছয়জন লোক এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে, পিন খোলা গ্রেনেডটা সেদিকে ছুঁড়ে দিল ও। রিফ্লেক্স অ্যাকশনই বলতে হবে, বনরক্ষীদের একজন গ্রেনেডটা লুফে নিল। ইতিমধ্যে নিজের দিকের জানালা বন্ধ করে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন মুর্তজা।

তাঁর পিছনের আংশিক খোলা জানালা দিয়ে রানার অপর হাতটা বেরিয়ে এল, মেশিন পিস্তল সহ। এক পশলা গুলি করল ও, প্রথমে ইন্সপেক্টরের উরু, তারপর বাকি চারজনের হাঁটু লক্ষ্য করে।

গ্রেনেড এখনও ফাটেনি, তবে মেশিন পিস্তল স্তব্ধ হবার আগেই বালির বস্তার আড়াল থেকে ছুটে এল ঝাঁক-ঝাঁক বুলেট।

বিশ গজ পেরিয়ে এল পাজেরো, দু'পাশে ছিটকে পড়ল খালি ড্রামগুলো। গাড়ির গায়ে মুষল ধারে বৃষ্টির মত বুলেট লাগছে। কোন রকমে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখছেন মুর্তজা, হিংস্র চিতার মত ছুটছে ওটা।

মেশিন পিস্তল রেখে দিয়ে আরেকটা গ্রেনেড তুলে নিয়েছে রানা। এক সারিতে পাঁচটা ট্রাক, দ্বিতীয় গ্রেনেডটা মাঝখানের হাফ-ট্রাকে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো প্রথমটা। কয়েক সেকেন্ড পর দ্বিতীয়টা।

বাঁক ঘোরার সময় বিকট আওয়াজ করল টায়ার। সদ্য ঘুম ভাঙা বাচ্চা দুটো চিৎকার করে কাঁদছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে পিছন দিকে তাকাল রানা। হতাশায় ছেয়ে গেল মনটা। মাত্র দুটো ট্রাকে আগুন জ্বলছে। বাকি তিনটে ট্রাক এরইমধ্যে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিচ্ছে বনরক্ষীরা। ওগুলো নিয়েই ওদেরকে ধাওয়া করা হবে।

দ্বিতীয় বাঁকটা ঘোরার সময় প্রকাণ্ড বোল্ডারটাকে পাশ কাটাল ওরা। 'গাড়ি থামান,' বলল রানা। পুরোপুরি থামার আগেই দরজা খুলে নেমে পড়ল ও, হাতে একজোড়া ফ্লেয়ার। রাস্তা এদিকে সরু, দু'পাশে ঘন ঝোপ আর পাতাবিহীন শুকনো গাছপালা। রাস্তার দু'পাশের ঝোপ আর গাছ লক্ষ্য করে দুটো ফ্লেয়ার ছুঁড়ল রানা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল আগুন।

তিন কিলোমিটার পর আবার গাড়ি থামালেন মুর্তজা। রাস্তার দু'পাশে আরও দুটো আগুন জ্বালল রানা। গাড়িতে ফিরে আসতে মিসেস ফাতেমা জিজ্ঞেস করলেন, 'এ আপনি কি করছেন, মি. রানা? গোটা জঙ্গলটাই তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

'আমি খোঁজ নিয়েছি,' বলল রানা। 'গোটা এলাকায় মাত্র পাঁচ-ছ'টা খামারবাড়ি। শুধু পাহারাদারই আছে, মালিকরা কেউ থাকে না। এমন কি গরু-ছাগলও না থাকারই মত।'

'তবু, এত বড় একটা জঙ্গল... [illegible] আগুন তো সব না পুড়িয়ে নিভবে না।'

'এই জঙ্গলের প্রতিটি গাছ [illegible] ভিটের,' বলল রানা। 'ধরে নিন তার কুশপুত্তলিকায় আগুন দিয়েছি। অল্প [illegible] ক'জন লোকের ক্ষতি হবে, মন্ত্রিনিগ্রোর গর্বকে বাঁচাবার স্বার্থে এই সামান্য ক্ষতি তাদের মেনে নেয়া উচিত।'

'পরিবেশটা দূষিত হবে,' মুর্তজা বিড়বিড় করে বললেন। 'ওয়াইল্ডলাইফও ধ্বংস হয়ে যাবে। নো অফেন্স, রানা। আমি শুধু পরিস্থিতিটা বর্ণনা করছি। [illegible]

উপায় নেই। পালাতে হলে এছাড়া সত্যিই আর কোন উপায় ছিল না। তবে কি জানো, খুশি হতাম যদি গাছগুলোর বদলে মিলোসেভিচকে অগ্নিস্নান করাতে পারতে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তার জন্যেও অগ্নিস্নান অপেক্ষা করছে,' বলল রানা। 'সব স্বৈরাচারকেই কোন না কোন অর্থে এক সময় পুড়তে হয়।'

দূরে একটা ওয়াচটাওয়ার দেখতে পেয়ে মুর্তজাকে আরেকবার গাড়ি থামাতে বলল রানা। আর মাত্র একজোড়া ফ্লেয়ার অবশিষ্ট আছে। একটা ছুঁড়ল ওয়াচটাওয়ার লক্ষ্য করে, শেষটা দিয়ে জ্বালাল রাস্তার ধারের শুকনো একটা ঝোপ। আধ ঘণ্টা পর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটা চূড়ায় উঠল পাজেরো। আরেকবার নিচে নামল রানা। ফেলে আসা এলাকার ওপর চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্ট হলো ও। জোরাল বাতাস থাকায় প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুতবেগে ছড়াতে শুরু করেছে কমলা রঙের শিখাগুলো। কার সাধ্য এই দাবাগ্নি থামায়। ফেলে আসা পথ পাঁচ মাইল পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কোন হেডলাইট চোখে পড়ল না।

বাডভাকে পিছনে ফেলে সাগরের দিকে ছুটছে পাজেরো। রাত এগারোটা বাজে, কিছুক্ষণ আগে ট্র্যাঙ্কুইলাইজার খাইয়ে বাচ্চা দুটোকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন মিসেস ফাতেমা। বাডভায়, নিজেদের খামারবাড়ির কাছে, গাড়িটাকে জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে ফেলতে হয়েছিল মুর্তজাকে। হেডলাইট নিভিয়ে বিশ মিনিট চুপচাপ বসে ছিল ওরা, মাথার ওপর চক্কর দেয়া শেষ করে হেলিকপ্টার চলে যাবার পর আবার রওনা হয়েছে সাগরের দিকে।

সুজায়েভের দেয়া এনভেলাপ খুলে হাতে আঁকা ম্যাপটা বের করল রানা। গাড়ির ভেতর আলো জ্বলছে, ম্যাপটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ও। 'এখানে দেখা যাচ্ছে একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে ঢাল বেয়ে সৈকতে নামতে হবে আমাদের, কেননা ওই সৈকতে পৌঁছানোর অন্য কোন পথ নেই। সুজায়েভ ওখানেই মাছ ধরার ট্রলারটা লুকিয়ে রেখেছেন।'

'বাচ্চা দুটোকে নিয়েই চিন্তা,' মুর্তজা বললেন। 'পাহাড়ে ওঠা, তার পর নামা···'

'ওটা কি ডালকান সৈকত?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ফাতেমা। 'আমি যতদূর জানি একমাত্র ডালকানেই সরাসরি পাহাড় বেয়ে নামতে হয়।'

'হ্যাঁ, ডালকানই।'

'তাহলে তো বিপদ। পাহাড়ের ঢালে অসংখ্য বোল্ডার ছড়িয়ে আছে। ওঠা বা নামার কোন পথই নেই। সৈকতটা আসলে দেখতে পাওয়াও সম্ভব নয়। একেবারে ছোট্ট এতটুকুন।'

'দুর্গম বলেই নিরাপদ,' বললেন মুর্তজা। 'সুজায়েভ একটা গুহার ভেতর লুকিয়ে রেখেছে ট্রলারটা।'

'কিন্তু কোন গুহায় চিনবে কিভাবে? ওখানে তো শুনেছি অনেক গুহা।'

'পৌঁছতে পারলে ঠিকই খুঁজে নেয়া যাবে,' স্ত্রীকে আশ্বস্ত করলেন মুর্তজা।

রানা বলল, 'বাচ্চাদের নিয়েও কোন চিন্তা করবেন না। ওদেরকে আমরা

কাঁধে তুলে নেব।'

'হেলিকপ্টার কিন্তু সাগরেও চোখ রাখবে,' ফাতেমা বললেন। 'শুনেছি গানবোটগুলো সারা রাত টহল দিয়ে বেড়ায় ওখানে।'

'ঝুঁকি তো আছেই, ফাতেমা। আল্লাহ যদি সহায় হন, কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এত দূর যে আসতে পেরেছি, বিশ্বাস করা যায়? সত্যি···মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি, জেগে নেই।'

'বাডভা থেকে আলবেনিয়া বেশি দূরে নয়, মাত্র চল্লিশ মাইল।'

'কিন্তু না, আমরা আলবেনিয়ার দিকে যাব না,' বলল রানা। 'কারণ ওরা আশা করবে ওদিকেই যাব আমরা।'

'আলবেনিয়ায় যাব না? তাহলে কোথায় যাব?'

'প্রায় একশো মাইল পাড়ি দিতে হবে,' বলল রানা। 'জাতিসংঘের তরফ থেকে ইটালি সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে, ওদের নৌবাহিনীর একটা ডেস্ট্রয়ার আমাদেরকে তুলে নেবে।'

হেডলাইটের আলোয় হঠাৎ সৈকত ও সাগর দেখা গেল। পাজেরো থামিয়ে মুর্তজা বললেন, 'গাড়িটা এখানেই রেখে যেতে হবে। পাহাড়ের সরাসরি নিচে রাখলে যার চোখে পড়বে সেই বুঝতে পারবে কোথায় যাচ্ছি আমরা।'

'সেক্ষেত্রে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখুন,' বলল রানা।

গাড়ির মুখ ঘোরাবার পর তাগাদা দিলেন মুর্তজা। 'নামো, ফাতেমা। তাড়াতাড়ি করো।'

ফাতেমার হাতে শুধু একটা লেদার ব্যাগ রয়েছে। ব্রিফকেসটা গাড়িতেই রেখে যাচ্ছে রানা, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সব ওর কোটের পকেটে। ওদের কন্যাটিকে কাঁধে তুলে নিল ও। পাণ্ডুলিপি রয়েছে বিলিয়ার্ডের দেয়া ব্যাগে, সেটা মুর্তজায়েভের বাঁ কাঁধে ঝুলছে। তিনি তাঁর ছেলেকে ডান কাঁধে তুলে নিলেন। সৈকত ধরে দ্রুত পায়ে রওনা হলো ওরা।

আকাশে চাঁদ নেই। তবে তারার আলোয় অন্ধকারে চিক চিক করছে সাগর। কোন ট্রলার বা নৌকা, কিছুই নেই পানিতে।

হাঁটার গতি ক্রমশ মন্থর হয়ে এল। সামনে অন্ধকার, পাহাড় থাকলেও দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই আরও অনেক দূরে সেটা। আরও পাঁচ মিনিট হাঁটার পর পাহাড় নয়, বোল্ডারের রাজ্যে প্রবেশ করল ওরা। একটু পরই অবশ্য জমিন ক্রমশ উঁচু হতে শুরু করল। অর্থাৎ পাহাড়েই উঠছে ওরা।

হঠাৎ এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। 'আড়াল নিন! জলদি!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। ওর দেখাদেখি পড়িমরি করে ছুটল সবাই, বড় একটা বোল্ডারের আড়ালে এসে বসে পড়ল।

উঁকি দিয়ে ফেলে আসা সৈকতে তাকাল রানা। সার্চ লাইট জ্বেলে একটা হেলিকপ্টার আসছে। পাজেরোকে দেখতে পেয়েছে পাইলট। এত দূর থেকেও পাইলটের সঙ্গীকে দেখা গেল, খোলা দরজা দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে আছে।

পাজেরোর একশো মিটার ওপরে স্থির হলো কপ্টার। সার্চলাইটের আলো সরাসরি গাড়িটার ওপর ফেলা হয়েছে। দরজা থেকে ব্রাশ ফায়ার শুরু করল

লোকটা। থেমে থেমে তিন পশলা গুলি করল। গাড়ি থেকে কেউ বেরুচ্ছে না দেখে কপ্টার নিয়ে আরও খানিক ওপরে উঠে গেল পাইলট। একটু পরই বিস্ফোরিত হলো পাজেরো। সন্দেহ নেই, কপ্টার থেকে গ্রেনেড ফেলা হয়েছে।

জ্বলন্ত পাজেরোকে ঘিরে কয়েকবার চক্কর দিল পাইলট, তারপর যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল।

কেউ কোন কথা বলল না। রানার পিছু নিয়ে আবার ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল সবাই। ঢালটা পাথুরে, তবে খাড়া নয়। বাধা সৃষ্টি করছে বোল্ডারগুলো। ছোট বড় সব রকমই আছে, কখনও টপকাতে হচ্ছে, কখনও পাশ কাটাতে। স্বভাবতই এগোবার গতি খুব মন্থর।

চূড়ায় উঠতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। কয়েকটা গাছের তলায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা, এই সময় আবার শোনা গেল এঞ্জিনের শব্দ। 'ওই ঝোপটা! ভেতরে ঢুকে পড়ুন,' লাফ দিয়ে সিধে হয়েই দৌড়াল রানা, বাচ্চা মেয়েটিকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে।

ঝোপের ভেতর মাত্র ঢুকেছে ওরা, পাহাড়ের চূড়ায় সার্চ লাইটের আলো পড়ল। 'কেউ নড়বেন না!' সাবধান করে দিল রানা, ঝোপের কয়েকটা ডাল কাঁপছে দেখে হাত বাড়িয়ে থামাল ওগুলো।

চূড়াটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে পাইলট। পাজেরো খালি ছিল, এটা সে ধরে ফেলেছে। সৈকতের অন্য দিকে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিল, কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে এদিকটা দেখতে এসেছে।

ঝোপের ফাঁক দিয়ে চূড়ার ওপর চোখ বোলাল রানা। বোল্ডার থাকায় এখানে পাইলট ল্যান্ড করতে পারবে না। তিন তিন বার চক্কর দিল সে, যেন এই জায়গা ছেড়ে নড়তে মন চাইছে না। শেষে সম্ভবত ফুয়েলের কথা ভেবেই ফিরে যেতে হলো তাকে।

কপ্টার দূরে মিলিয়ে যেতে চূড়া থেকে নামার প্রস্তুতি নিল রানা। 'নামার সময় টর্চ জ্বাললে সাগর থেকে দেখা যাবে আলোটা,' বলল ও। 'কাজেই একান্ত প্রয়োজন না হলে আলো জ্বালবেন না কেউ।'

'আমার ব্যাগে একজোড়া পেন্সিল টর্চ আছে,' বললেন ফাতেমা।

'হ্যাঁ, পেন্সিল টর্চ জ্বালা যায়। বের করুন।'

'আমি জানি আপনাদের খিদে লেগেছে,' ফাতেমার কণ্ঠে গৃহিণীসুলভ মমতা। 'টিফিন ক্যারিয়ারে দুপুরের খানিকটা খাবার রেখে দিয়েছি আমি। প্লেট তো নেই, হাত দিয়ে নিয়ে খেতে হবে…'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'এখন নয়, মিসেস মুর্তজা, ট্রলারে ওঠার পর। বিপদ এখনও কাটেনি।'

ম্লান সুরে ফাতেমা বললেন, 'না, মানে, ভাবছিলাম এই সুযোগে মেয়েটার ঘুম ভাঙিয়ে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করব। ছেলেটা চকলেট আর দুধ খেয়েছে, কিন্তু মেয়েটা আমার কিছুই মুখে দেয়নি…'

'দুঃখিত, এখন সম্ভব নয়,' রানার গলার আওয়াজ একটু বোধহয় কঠিন হয়ে গেল। 'আসুন।' অন্ধকারেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও। বাধ্য

হয়েই ওকে অনুসরণ করলেন ফাতেমা। কিছু বললেন না বটে, তবে রানার আচরণে আঘাত পেয়েছেন। একটু পর স্বামী-স্ত্রীর ফিসফাস শুনতে পেল রানা। তারপর ওর হাতে মুর্তজা একটা পেন্সিল টর্চ গুঁজে দিলেন।

মাঝে-মধ্যে পিছন থেকে রানাকে পথ-নির্দেশ দিচ্ছেন মুর্তজা, তার কথা মত দিক বদল করছে রানা। পাথুরে জমিন ক্রমশ ঢালু দেখে বোঝা গেল চূড়া থেকে নামতে শুরু করেছে ওরা। অনেক নিচে সাগর, তবে বোল্ডারের আড়াল থাকায় দেখা যাচ্ছে না।

মিনিট দশেক নামার পর অকস্মাৎ সাপ দেখার মত চমকে উঠল রানা। 'থামুন!' কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

'কি হলো?' রানার গায়ে ধাক্কা খেতে গিয়ে নিজেকে কোন রকমে সামলে নিলেন মুর্তজা।

রানার মাত্র একপা সামনে গভীর খাদ, সরাসরি নিচের সাগরে নেমে গেছে। সামান্য একটা পেন্সিল টর্চ এ-যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছে ওকে। 'ভুল করেছি আমরা,' বলল ও। 'সৈকতটা এদিকে নয়, অন্য কোনও দিকে।'

পেন্সিল টর্চের আলোয় গভীর খাদটা এবার মুর্তজাও দেখতে পেলেন। 'সর্বনাশ!'

তাঁর হাতে পেন্সিল টর্চটা ধরিয়ে দিয়ে পকেট থেকে ম্যাপ বের করল রানা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'অনেক বেশি বাম দিকে সরে এসেছি। ওপরে ফিরে যাবার দরকার নেই, খাদের কিনারা ধরে ডান দিকে যেতে হবে।'

হাঁটার গতি আরও মন্থর হয়ে পড়ল। কাঁধের বোঝাটা কয়েক মণ ভারী লাগছে, আড়ষ্ট ভাব দূর করার জন্যে মেয়েটাকে খানিক পরপর এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে বদল করছে রানা। বারবার দাঁড়াতে হচ্ছে ওকে, কারণ ক্লান্ত ফাতেমা পিছিয়ে পড়ছেন। খাদের ওপর একটা চোখ রেখেছিল বলেই ব্যাপারটা টের পেল রানা—সেটা আর নেই। প্রায় ত্রিশ মিটার নিচে চিকচিক করছে সাগর। তারার আলোয় পরিষ্কার নয় কিছুই, তবে মনে হলো নিচে একটা ছোট্ট সৈকত আছে।

সত্যি আছে কিনা দেখার জন্যে নামতে হবে ওদেরকে। আর নামা যখন যাচ্ছে, নিচে সৈকত না থেকে পারে না। এক সময় নরম বালিতে পা পড়ল। 'আগে ট্রলারটা খুঁজে বের করুন, তার আগে এখান থেকে আমি নড়ছি না,' বলে বালির ওপর বসে পড়লেন ফাতেমা। রানার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'দিন, আমার মেয়েকে দিন।'

একটা চাদর বিছানো হলো, তাতে ছেলেটাকেও শুইয়ে দিলেন মুর্তজা। রানাকে নিয়ে ট্রলার খুঁজতে বেরুলেন তিনি। সৈকতটা খুবই ছোট, দৈর্ঘ্যে মাত্র পনেরো মিটার, প্রস্থে আরও কম। সন্দেহ নেই, জোয়ারের সময় এই সৈকত পুরোটাই তলিয়ে যায়।

'গুহাগুলো ডান দিকে না বাম দিকে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না। এই সৈকতে একবারই মাত্র নেমেছিলাম, আমার তখন পনেরো কি ষোলো বছর বয়স...'

'ম্যাপেও কিছু বলা হয়নি,' বলল রানা। 'আসুন, খুঁজতে হলে পানিতে নামতে হবে।' ওর পিছু নিয়ে ডান দিকের সৈকত থেকে পানিতে নামলেন মুর্তজা।

টর্চ জ্বালতে ভয় পাচ্ছে রানা। অন্ধকার সাগরে নৌবাহিনীর গানবোট আলো নিভিয়ে অপেক্ষা করে থাকলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সেক্ষেত্রে টর্চ জ্বালা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। পায়ের নিচে বালি নয়, পাথর পাচ্ছে ওরা। আশপাশের পানিতেও প্রচুর বোল্ডার মাথা উঁচু করে পড়ে আছে।

'আমরা বোধহয় ভুল করেছি,' বলল রানা। 'গুহার সামনে এত বোল্ডার থাকলে ট্রলার ঢোকানো হয়েছে কিভাবে?'

'চলুন তাহলে বাম দিকটা দেখি।'

সাগর থেকে উঠে এল ওরা। ফাতেমাকে পাশ কাটাবার সময় রানা দেখল, ঘন ঘন ঝাঁকি দিয়ে মেয়ের ঘুম ভাঙাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন তিনি।

বাম দিকের পানিতেও বোল্ডার আছে, তবে গায়ে গায়ে লেগে নেই। পানির গভীরতা এক সময় হাঁটু সমান হলো। হাতের আড়ালে পেন্সিল টর্চ জ্বেলে পাহাড়ের গা পরীক্ষা করছে রানা। গুহা একটা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সেটা এত সরু যে ভেতরে কোন বোট ঢুকবে না। পাঁচ মিটার দূরে আরও একটা গুহামুখ পাওয়া গেল। এটা বেশ চওড়া। রানা যখন ভেতরে ঢুকল, ওর কোমর ডুবে গেছে। অন্ধকার গুহা, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আরও খানিকটা ভেতরে ঢুকে ছয় ব্যাটারির টর্চটা একবার জ্বেলেই নিভিয়ে ফেলল। আছে, পুরানো একটা ট্রলার গুহার গায়ে সেঁটে আছে। ওটার দু'পাশে টায়ার লাগানো, ফলে ঢেউয়ের দোলায় দেয়ালে বাড়ি খেলেও কাঠামোর কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

'সৈকতে পানি কম, ট্রলারে উঠতে হলে হেঁটে গুহার ভেতর ঢুকতে হবে সবাইকে,' বলল রানা। 'চলুন, ওদেরকে নিয়ে আসি।'

সৈকতে ফিরে এসে রানা দেখল, ঘন ঘন ঝাঁকি দিয়ে মেয়ের শুধু ঘুমই ভাঙাননি ফাতেমা—আয়োজন করে তাকে প্যাকেট দুধ, চকলেট আর বিস্কিট খাওয়াচ্ছেন। ঝুঁকে ছেলেকে কাঁধে তুলে নিলেন মুর্তজা। রওনা হয়ে কয়েক পা এগোলেন, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালেন। রানা পাশে দাঁড়িয়ে আছে, দেখেও না দেখার ভান করে মেয়েকে খাওয়াতে ব্যস্ত ফাতেমা। মুর্তজা বললেন, 'তাড়াতাড়ি করো, ফাতেমা। খোলা সৈকতে বেশিক্ষণ থাকাটা বোকামি হয়ে যাচ্ছে। রানার হাতে তুলে দাও ওকে।'

'ঠিক আছে, আপনি যান,' রানাকে বলল ফাতেমা। 'ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

ট্রলারটা ত্রিশ ফুট লম্বা। দেখতে পুরানো হলেও, ইয়ামাহা এঞ্জিনটা প্রায় নতুন, ঘণ্টায় চোদ্দ নট গতিতে ছুটতে পারে। ট্রলারটার কোন নাম নেই, তবে দু'দিকের গায়ে নম্বর লেখা আছে, আপসাইডডাউন, অর্থাৎ উল্টাপাল্টা সিক্সটিনাইন।

মুর্তজা বললেন, 'এই নম্বর সার্ব ব্যবসায়ী সমিতির দেয়া। নম্বর দেখেই অন্যান্য ট্রলারের জেলেরা বলে দিতে পারে কে কোনটার মালিক। ...একটা কাগজ রেখে গেছে সুজায়েভ, তাতে এই ট্রলারের মালিকের নাম লেখা আছে। কেউ যদি

থামিয়ে প্রশ্ন করে, বলতে হবে মালিক অসুস্থ, তার বদলে আমরা মাছ ধরতে এসেছি।'

ফতুয়ার মত দেখতে চামড়ার তৈরি লাল জামা গায়ে দিল ওরা। ট্রলারের ডেকে মাছ ধরার জাল, মাছের পেট কাটার জন্যে টেবিল ও ছুরি, সবই আছে। নিচের হোল্ডে কয়েকটা কম্বল পাওয়া গেল, বাচ্চা দুটোকে নিয়ে সেগুলোর ওপর শুয়ে পড়লেন ফাতেমা। পানি, শুকনো খাবার, টর্চ, ফ্লেয়ার, লাইফজ্যাকেট ইত্যাদি আরও অনেক কিছু পাওয়া গেল একটা ব্যাগে। রানা সুজায়েভকে ছদ্মবেশ নেয়ার কিছু উপকরণ যোগাড় করতে বলেছিল, সেগুলোও একটা ব্যাগে পাওয়া গেল।

হুইলহাউসে ঢুকে কাগজটার ভাঁজ খুললেন মুর্তজা। 'মালিকের নাম দেবারভিল ডুবচেক। ওহ্, গড!'

'কি হলো?'

'দেবারভিল, দেবারভিল,' বিড়বিড় করছেন মুর্তজা। 'ড. সিডাকের ভাই ডুবচেক। আপনি জানেন না, ড. সিডাকের পুরো নাম দেবারভিল সিডাক?'

'কিন্তু তা কি করে হয়?' বলল রানা। 'পুলিস চীফের ভাই জেলে?'

'জেলে নয়, জেলে নয়,' মাথা নেড়ে বললেন মুর্তজা। 'ডুবচেক জেলে সমিতির সাধারণ সম্পাদক। এরকম আরও অনেক বোট আছে তার, ভাড়া খাটায়। ব্যাপারটা ভাল হলো নাকি খারাপ ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমার ধারণা, ভালই হলো,' বলল রানা। 'ডুবচেকের বোটকে সহজে কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না, অন্তত জেলেরা তো নয়ই।'

'তা ঠিক, কিন্তু সুজায়েভ যদি এটা চুরি করে এনে থাকে, নৌ-পুলিস নিশ্চয়ই এটাকে খুঁজবে।'

রানা গম্ভীর হয়ে গেল। 'আমি আরও একটা সমস্যা দেখতে পাচ্ছি, মি. মুর্তজা।'

'কি?'

'মাছ ধরার ট্রলারে লোক থাকার কথা কমপক্ষে পাঁচ-সাতজন, তাই না? কিন্তু আমরা মাত্র দু'জন।'

কামানো মাথায় হাত বুলালেন মুর্তজা। 'তাই তো! তার ওপর, আপনি যেহেতু স্থানীয় নন, কোন বোটকে কাছাকাছি আসতে দেখলে আপনাকে লুকিয়ে পড়তে হবে। এখন উপায়?'

'হামলা হলে পাল্টা হামলা করার দরকার হবে,' বলল রানা। 'কাজেই আমার লুকানো চলে না। হুইলহাউসেই থাকব আমি, তবে কম্বল মুড়ি দিয়ে। কথাবার্তা আপনিই বলবেন। বলবেন, আমার জ্বর। আর ক্রুরা? তারা নিচের হোল্ডে ঘুমাচ্ছে।'

'ঠিক আছে। এখন তাহলে রওনা হতে পারি আমরা, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, আর দেরি করা উচিত নয়,' বলল রানা। আবার পানিতে নামতে হলো ওকে। রশি ধরে টেনে ট্রলারকে গুহা থেকে বের করে আনল। বোটের গা থেকে টায়ারগুলোও খুলতে হলো ওকে। না খুললে যে দেখবে তারই সন্দেহ হবে,

কোনও গুহায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ঊনসত্তর নম্বরকে।

রানা হুইলহাউসে ঢুকতে স্টার্ট দিলেন মুর্তজা। রানা দিক নির্দেশ দিল, 'নাক বরাবর সোজা দশ নট, তারপর সৈকত ডানে রেখে পুবদিকে।'

স্পীড বাড়ালেন মুর্তজা। 'কেন, পুবদিকে কেন? আপনি তো বললেন, আমরা আলবেনিয়ায় যাব না।'

'খোলা সাগরে নিঃসঙ্গ একটা ট্রলার দেখলে হেলিকপ্টার বা গানবোটের ওরা সন্দেহ করবে না?'

'হ্যাঁ, তা করবে...'

'জেলেরা দল বেঁধে আলবেনিয়ার দিকেই যায়, কারণ ওদিকে সবচেয়ে বেশি মাছ পাওয়া যায়,' আবার বলল রানা। 'কাজেই আমাদেরকেও ওদের ভিড়ে মিশে যেতে হবে। তারপর যখন একটা দুটো করে ফিরতি পথ ধরবে ট্রলারগুলো, সুযোগ বুঝে আমরাও ইটালির দিকে রওনা হব।'

দশ নটিক্যাল মাইল পেরিয়ে এসে রানার কথামতই পুব দিকে ট্রলার ঘুরিয়ে নিলেন মুর্তজা। পুবদিকে আরও বিশ নট এগোবার পর ট্রলার-বহরটাকে দেখতে পেল ওরা। এখনও সেটা পাঁচ নট দূরে, আলো জ্বেলে মাছ ধরছে।

'আমরা যে রওনা হয়েছি, তা কি ইটালি কর্তৃপক্ষ জানে?'

'জানে,' আশ্বস্ত করল রানা। 'কেন, দেখেননি, আপনার বাড়ি থেকে ইটালি দূতাবাসে ফোন করলাম আমি।'

'ফোন করতে দেখেছি, কার সঙ্গে কি কথা হলো তা শুনিনি।'

হঠাৎ রানার শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। 'এ কি! ওরা তো মাছ ধরছে না!'

এতক্ষণে মুর্তজাও খেয়াল করলেন ব্যাপারটা। ট্রলারের বহরটা তীরবেগে ওদের দিকেই ছুটে আসছে। আলো দেখে বোঝা গেল, বহরে কম করেও ত্রিশ চল্লিশটা ট্রলার রয়েছে। বিশাল একটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ওগুলো, তবে সন্দেহ নেই, ফিরেই আসছে।

'আরে, এর মানে কি?'

'স্পীড কমান,' বলল রানা, মেশিন পিস্তলটা পায়ের কাছ থেকে তুলে কোলের ওপর রাখল।

দেখতে দেখতে ট্রলার বহর কাছে চলে এল। পানির ছিটা লেগে হুইলহাউসের কাঁচ ঝাপসা হয়ে আছে। কয়েকটা ট্রলার পাশ কাটাল ওদেরকে। হুইলহাউসের ছাদ সরিয়ে সিধে হলেন মুর্তজা। সামনে আরেকটা ট্রলার, একেবারে গা ঘেঁষে ওদেরকে পাশ কাটাবে। তাঁর মুখে টর্চের আলো পড়ল। হাত তুলে নাড়লেন মুর্তজা। ফিরতি মুখী ট্রলার স্পীড কমাল। 'এই যে ঊনসত্তর, ওদিকে যাচ্ছ কোথায়? কি ঘটেছে জানো না?'

মুর্তজাও সার্ব-ক্রোট ভাষায় চিৎকার করে জবাব দিলেন। 'কেন, কি ঘটেছে?'

'কোন্ শালা নাকি পালাচ্ছে!' পাশের ট্রলার থেকে বলল লোকটা। 'নৌবাহিনীর গানবোট তাকে ধরার জন্যে সাগর চষে বেড়াচ্ছে। আমাদেরকে বলা হয়েছে, বসনিয়ার দিকে গিয়ে মাছ ধরতে।'

'বোট ঘুরিয়ে নিন,' বলল রানা। 'বহরের পিছু নিয়ে একজোড়া গানবোট

আসছে।'

তাড়াতাড়ি ট্রলার ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরলেন মুর্তজা।

দুটো ট্রলার এখন পাশাপাশি ছুটছে। প্রশ্ন ভেসে এল, 'কিন্তু বসনিয়ার দিকে ঘোড়ার ডিম মাছ পাওয়া যাবে। তোমরা কি করবে, ঊনসত্তর? মাছ ধরবে, নাকি ডেরায় ফিরে যাবে?'

'ভাবছি,' জবাব দিলেন মুর্তজা।

'তোমাদের লোকজন কই?'

'নিচে ঘুমাচ্ছে,' বললেন মুর্তজা। 'তোমরা কি করবে?'

জবাব এল, 'অন্তত দশটা বোট মাঝ সাগরে যাচ্ছে, আমরাও থাকছি সঙ্গে। কিন্তু সবাই জানে মাঝ সাগরেও মাছ নেই।'

'তাহলে?'

'আরে, রহস্যটা বুঝলে না? মাঝ সাগরের কথা বলে আমরা আসলে ইটালির উপকূলে হানা দেব। সাগরে যখন বেরিয়েছি, খালি হাতে তো আর ফিরতে পারি না।'

'বলুন,' বুদ্ধি দিল রানা, 'আমরাও তোমাদের সঙ্গে আছি।'

তাই থাকল ওরা, কিন্তু বিপদ পিছু ছাড়ল না। মাঝ সাগরে পৌঁছাতে রাত সাড়ে তিনটে বেজে গেল। ইটালি এখান থেকে আরও পঞ্চাশ নট দূরে। এই সময় সার্চলাইট জ্বেলে বহরটাকে ধাওয়া করল একজোড়া গানবোট। আসলে, কাউকেই ওরা কোন উপকূলের দিকে যেতে দিতে রাজি নয়।'

সব মিলিয়ে দশটা ট্রলার, গানবোটের তাড়া খেয়ে পালাতে শুরু করল। পাইলটরা সবাই মন্ট্রিনিগ্রো কিংবা বসনিয়ার দিকে ছুটছে।

'কপালে যা আছে, আমরা ফিরছি না,' বলল রানা। 'ফুলস্পীড দিন। নাক বরাবর সোজা চলুন।'

'কিন্তু ওরা ধাওয়া করবে! গানবোটের স্পীড আমাদের চেয়ে বেশি!' প্রতিবাদ করলেন মুর্তজা।

'আমাদের চেয়ে স্পীড বেশি? মনে হয় না। তাছাড়া, ভয় স্পীডকে নয়, মি. মুর্তজা। ভয় ওদের কামানের রেঞ্জকে। যখন দেখবে আমরা থামছি না, কামানের গোলা ছুঁড়ে ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে।' কথাটা নির্মম হলেও, বাস্তবে ঠিক তাই ঘটতে শুরু করল।

ঊনসত্তর ফুলস্পীডে পালাচ্ছে, দেখতে পেয়ে ধাওয়া করল একটা গানবোট। এক নট পিছনে ছিল ওটা, স্পীড বাড়াবার পর দূরত্ব একই থাকল না, ধীরে ধীরে কমতে শুরু করল। তারমানে রানার ধারণা ভুল, গানবোটের স্পীড ট্রলারের চেয়ে কিছু বেশিই হবে।

চারটে বাজল। ভোর হতে আরও এক ঘণ্টা বাকি। গানবোট সিকি নট পিছনে চলে এসেছে। ধীরে ধীরে হলেও, মাঝখানের ব্যবধান আরও কমছে।

তারপর সার্চলাইটের আলো পড়ল ট্রলারের গায়ে। অসহায় বোধ করছে রানা। আলো জ্বালার মানে এবার কামান দাগা হবে। নিজের কথা ভাবছে না,

এমনকি মুর্তজা দম্পতির কথাও নয়, ভাবছে বাচ্চা দুটোর কথা। অন্তত ওদেরকে যদি বাঁচাতে পারা যায়···কিন্তু কিভাবে? সাগর প্রায় শান্তই বলা যায়, কিন্তু অন্ধকার। ইটালির উপকূল এখনও সম্ভবত বিশ নট দূরে। আশপাশে কোন জাহাজ বা অন্য কোন জলযান নেই, থাকলে আলো জ্বলত।

'আমি নিচে যাচ্ছি,' বলল ও। 'এখুনি ফিরে আসব। ইতিমধ্যে ওরা যদি ফায়ার করে, তবু আপনি থামবেন না।'

নিচে নেমে এসে রানার মন আরও খারাপ হয়ে গেল। বাচ্চা দুটোকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন ফাতেমা। ওদের ঘুম ভাঙাবার আগে ব্যাগ থেকে ছোটবড় কয়েকটা লাইফজ্যাকেট বের করল ও। আরেকটা লম্বা ব্যাগে হাত গলাল, অস্ত্রগুলো বের করে তৈরি রাখতে চায়। রাইফেল ছাড়াও ভিতরে ভারী ও লম্বা কিছুর অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বের করে আনল রানা ওটা।

ল্যাম্পের আলোয় জিনিসটা চিনতে পেরে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ল রানা। ও কি সুজায়েভকে গ্রেনেড লঞ্চার যোগাড় করতে বলেছিল? না, অসম্ভব! ও জানে, এ-ধরনের একটা জিনিস যোগাড় করা সুজায়েভের সাধ্যের বাইরে, কাজেই কেন তাকে বলতে যাবে? তারমানে সুজায়েভকে আন্ডারএস্টিমেট করেছে ও। যেভাবে বা যেখান থেকেই হোক, জিনিসটা যোগাড় করে এখানে রেখে গেছে সে। কিন্তু জানল কিভাবে, গ্রেনেড লঞ্চার দরকার হতে পারে ওদের? লঞ্চার যখন আছে, নিশ্চয়ই গ্রেনেডও পাওয়া যাবে?

ব্যাগ হাতড়াতে তা-ও পাওয়া গেল। বেশ অনেকগুলো।

ওদের ঘুম না ভাঙিয়েই ট্রলারের ডেকে উঠে এল রানা। রেঞ্জের বাইরে হলেও ওদের হুঁশিয়ার করার জন্য রাইফেল তাক করে কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল ও গানবোটের ব্রিজ লক্ষ্য করে। সাবধান, বেশি কাছে এসো না!

'ওহ্ গড! ওহ্ মাই গড!' হুইলহাউস থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন মুর্তজা।

রাইফেলের গুলিকে মোটেও ভয় পেল না ওরা, আরও কাছে চলে আসছে গানবোট। তারপর কামান দাগল। পর পর দুটো শেল ছুটে এলো। একটা পড়ল দশহাত পিছনে, অপরটা ছাত উড়িয়ে নিয়ে গেল হুইলহাউসের।

আর একটু কাছে আসতে দিল রানা ওদের। তারপর লঞ্চার তাক করে দুটো গ্রেনেড ছুঁড়ল গানবোটের দিকে। কিন্তু দুটোর একটাও লাগাতে পারল না।

'রানা!' হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন মুর্তজা।

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দক্ষিণ দিকে তাকাল রানা। ওদিক থেকে তীরবেগে ছুটে আসছে দ্বিতীয় গানবোট। ও শুধু নতুন বিপদটাকেই দেখছে না, কল্পনার চোখে মুর্তজায়েভের দুই বাচ্চার লাশও দেখতে পাচ্ছে।

মৃত্যু সুনিশ্চিত, উপলব্ধি করার পর সমস্ত অসহায়বোধ নিমেষে উধাও হয়ে গেল। পরিস্থিতি, প্রকৃতি ও নিয়তি যখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দপ করে জ্বলে উঠতে পারে বলেই তো ও মাসুদ রানা। কোটের পকেট হালকা হতে শুরু করল, একটা করে গ্রেনেড বের করে লঞ্চারে সেট করছে, ট্রিগার টেনে ছুঁড়ে দিচ্ছে দ্বিতীয় গানবোটকে লক্ষ্য করে। ওটার পাইলট হিসেবে ভুল করে [illegible] নিরাপদ দূরত্বে থাকার গরজ অনুভব করেনি, সেই ভুলের খেসারত

দিতেই হলো। পর পর দুটো গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো–একটা লাগল হুইলহাউসে, আরেকটা পেট্রল ট্যাংকে। পানির ওপর আগুনে গোসল করছে গানবোট। অগ্নিকুণ্ড ডিগবাজি খেয়ে ডুবতে শুরু করল।

কি ঘটছে দেখায় মগ্ন ছিলেন মুর্তজা, ঢেউগুলোকে ঠিক মত সামাল দিতে পারেননি, ফলে গতি অনেকটাই কমে গেছে। এই সুযোগে প্রথম গানবোট আগের চেয়ে কাছে সরে এসেছে। সেটাকে লক্ষ্য করে আরও একটা গ্রেনেড ছুঁড়ল রানা। লাগল বটে, কিন্তু তেমন কোন ক্ষতি করতে পারল না গানবোটের।

তারপর কোটের পকেট থেকে খালি হাত বেরিয়ে এল। আর কোন গ্রেনেড নেই।

'রানা!' আবার চেঁচিয়ে উঠলেন মুর্তজা। এবার তাঁর গলায় উল্লাস।

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে ট্রলারের নাক বরাবর সামনে তাকাল রানা। দিগন্তে দেখা যাচ্ছে সাদা বকের মত ঝকঝকে একটা জলযান। দূরে বলে ছোট দেখাচ্ছে, তবে চিনতে অসুবিধে হলো না। ইটালিয়ান নৌবাহিনীর একটা ডেস্ট্রয়ার ওদেরকে তুলে নিতে আসছে।

কিন্তু এখনও ওটা অনেক দূরে। অথচ রানার কাছে কোন গ্রেনেড নেই।

তাছাড়া, আন্তর্জাতিক জলসীমায় যুগোশ্লাভ নৌবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া হয়তো এড়িয়েও যেতে পারে ইটালিয়ান ডেস্ট্রয়ারটা।

পিছন দিকে তাকাতে যাবে রানা, বিপদ যা ঘটার ঘটে গেল। বাতাসে শিস কেটে ছুটে এল আরেকটা শেল, লাগল সরাসরি ট্রলারের পিছনে।

আক্ষরিক অর্থেই লেজের ওপর খাড়া হয়ে গেল ট্রলার। ছিটকে পানিতে পড়ল রানা। বিশাল একটা ঢেউ মাথায় তুলে নিল ওকে। খাড়া অবস্থা থেকে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল ট্রলার। প্রায় ডুবে গেল ওটা, তারপর আবার ভেসে উঠল। যখন ডুবছে, ঢেউটা আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেছে ওকে ট্রলারের ডেকে। ফাতেমা আর বাচ্চা দুটোর কান্না ও চিৎকার শুনতে পাচ্ছে রানা। ট্রলার এখনও ছুটছে, কিন্তু হুইলহাউসে নিষ্প্রাণ মূর্তিতে পরিণত হয়েছেন মুর্তজা। রানা ঠিক বুঝতে পারল না ভদ্রলোক জ্ঞান হারিয়েছেন কিনা।

ট্রলারের পিছনটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। খোলের ভেতর পানি ঢুকছে, যে-কোন মুহূর্তে তলিয়ে যাবে। ক্রল করে মইয়ের ধাপগুলো পেরুল রানা, হোল্ডে নেমে দেখল, পানিতে খাবি খাচ্ছে বাচ্চা দুটো। ফাতেমা মাছ ধরার ভঙ্গিতে ছোঁ মারছেন, কিন্তু ছটফট করায় কাউকে ধরতে পারছেন না। ওদেরকে দুই কাঁধে তুলে নিল রানা, একজোড়া লাইফজ্যাকেট ধরিয়ে দিল ফাতেমার হাতে। 'ভয় নেই, জাহাজ এসে গেছে। ছেলেকে নিয়ে যতক্ষণ পারা যায় পানিতে ভেসে থাকার চেষ্টা করবেন।'

ফোঁপাচ্ছেন ফাতেমা, তবে রানার কাঁধ থেকে ছেলেকে তুলে নিলেন। রানার দেখাদেখি লাইফজ্যাকেট পরাবার পর নিজেও একটা পরে নিচ্ছেন। তারপর খুব দ্রুত ঘটে গেল সব কিছু। ছেলেকে কোলে নিয়ে কোন রকম দাঁড়িয়েছেন ফাতেমা, পিছন থেকে তাকে ঠেলে মইয়ের ধাপে তুলে দিল রানা। পিছু নিয়ে নিজেও উঠল। ইতিমধ্যে ডুবতে শুরু করেছে ট্রলার। অনেকটা কাছে চলে আসা ডেস্ট্রয়ার

থেকে কামান দাগা হচ্ছে, একটা গোলা গানবোটকে ছাড়িয়ে গেল। স্পীড কমাবার আগে ট্রলারকে লক্ষ্য করে আরেকটা গোলা ছুঁড়ল গানবোটের গানার। সেটাই কাল হলো। ট্রলার দু'টুকরো হয়ে গেল। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো রানা, ওর হাত থেকে বাতাস যেন ছিনিয়ে নিল মেয়েটাকে, তারপর প্রকাণ্ড একটা ঢেউ কেড়ে নিল বাতাসের কাছ থেকে। পরমুহূর্তে শুরু হলো ব্রাশ ফায়ার। আরেকটা ঝাঁকি খেলো রানা, চোখ নামিয়ে দেখল ওর বাম কাঁধের কাছে কোট অদৃশ্য হয়েছে, সাদা শার্ট লাল হয়ে উঠছে। ঘাড় ফেরাতে ট্রলারের দ্বিতীয় খণ্ডে মুর্তজাকে দেখতে পেল ও, স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে পানিতে লাফ দিতে যাচ্ছেন। পরমুহূর্তে তলিয়ে গেল ট্রলার।

ডেস্ট্রয়ারের দুটো চারইঞ্চি কামান মুহুর্মুহু গর্জে উঠছে। একজোড়া হাইস্পীড বোট নামানো হয়েছে পানিতে, তীরবেগে ছুটে আসছে ওগুলো। অবস্থা বেগতিক দেখে লেজ তুলে পালাতে শুরু করল গানবোট।

ট্রলারের কাঠের একটা চওড়া তক্তাকে নিয়ে খেলছে ঢেউগুলো, সেটার ওপর বসিয়ে রাখা হয়েছে ছেলেটাকে, মুর্তজা দম্পতি এক হাতে তক্তা ধরে আছেন, আরেক হাতে ছেলেকে। উঁচু ঢেউয়ের আড়াল থাকায় দু'জনেই তাঁরা বিস্ফারিত চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন, কিন্তু রানা বা মেয়েকে কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না।

ডেস্ট্রয়ার থেকে পাঠানো একটা বোট ওদের কাছে পৌঁছে গেল, আরেকটা চলে গেল পাশ কাটিয়ে পিছন দিকে। প্রথম বোটের ইউনিফর্ম পরা লোকজন পানি থেকে তুলছে ওদেরকে, ফাতেমা ফুঁপিয়ে উঠে বললেন, 'আমার মেয়ে! সুলতানা! আমার মেয়ে…'

'আপনি শান্ত হন,' একজন ইটালিয়ান ক্রু বলল। 'নিন, এই কম্বলটা গায়ে জড়ান…'

স্বামীকে জড়িয়ে ধরে অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়লেন ফাতেমা। 'আমার মেয়েকে এনে দাও! আমার সুলতানাকে…'

স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়ার কথা ভুলে গেছেন মুর্তজা, চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছেন বোটের ক্রুদের দিকে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, তাদের সবার মুখেই হাসি।

দ্বিতীয় বোটটা ইউ টার্ন নিয়ে ফিরে যাচ্ছে ডেস্ট্রয়ারের দিকে। সেদিকে একটা হাত তুলল একজন ক্রু। বলল, 'মি. ও মিসেস মুর্তজা, ওই দেখুন, আপনাদের মেয়ে আমাদের দ্বিতীয় বোটে।'

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভাল করে দেখার জন্যে বোটের কিনারায় আছড়ে পড়লেন। ঘটনা সত্যি। পরম আনন্দে তাঁরা দেখলেন, ইউনিফর্ম পরা একজন ক্রু সুলতানাকে কোলে নিয়ে দ্বিতীয় বোটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'আল্লাহ মহান,' বিড় বিড় করছেন মুর্তজা।

'কিন্তু মি. রানা?' ঝট করে ঘাড় বাঁকিয়ে ক্রুর দিকে তাকালেন ফাতেমা।

'উনি সম্ভবত আহত হয়েছেন। তাঁকে বোটে তোলার পর ডেকে শুইয়ে দেয়া

হয়েছে। আহত অবস্থায় সাঁতরাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, তাঁর পিঠে ছিল মেয়েটি…'

প্রবল ক্লান্তি নাকি আনন্দের আতিশয্য বলা কঠিন, স্বামীর বুকে জ্ঞান হারালেন ফাতেমা।

এপ্রিল মাসের নয় তারিখে সারায়েভোর মুসলমানরা তিরানব্বুই সালের মর্মান্তিক দাঙ্গার স্মরণে শোক মিছিল বের করে। রানার রিপোর্ট পেয়ে জাতিসংঘ আগেই সতর্ক করে দিল বসনিয়া সরকারকে, ফলে মিছিল-মীটিং নিষিদ্ধ করা হলো। যুগোশ্লাভিয়ার কসোভো থেকে ইউ.এন পীস মিশন-এর আড়াইশো সদস্যকে পাঠানো হলো সারায়েভোর পুব দিকে। আট তারিখেই এলাকায় কারফিউ জারি করা হলো। তবে এত সতর্কতার কোন প্রয়োজন ছিল না, যুগোশ্লাভ জাতীয় যুবদলের কুখ্যাত নেতা কার্চিক জোডা নিখোঁজ হওয়ায় বসনিয়ার ওই এলাকা দখল করার কোন চেষ্টাই করা হলো না।

মাইক্রোফিল্মটা পরীক্ষা করে কোফি আনানের কাছে রিপোর্ট করা হলো। সময় নষ্ট না করে মাইক্রোফিল্মের একটা কপি সহ রিপোর্টটা ইন্টারন্যাশনাল ওঅর ক্রাইম ট্রাইবুনাল-এর হেডঅফিস জেনেভায় পাঠিয়ে দিলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট স্লোবোডান মিলোসেভিচের বিরুদ্ধে আরও একটা কেসের ফাইল তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হলো।

প্রতিটা ওঅর ক্রাইমের জন্য জবাবদিহি করতে হবে তাঁকে।

***